বাঁশরী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঁশরী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৪০
পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৫৪

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

বাঁশরী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্রীমতী বাঁশরী সরকার বিলিতি য়ুনিভার্সিটিতে পাস করা মেয়ে। রূপসী না হলেও তার চলে। তার প্রকৃতিটা বৈদ্যুতশক্তিতে সমুজ্জ্বল, তার আকৃতিটাতে শান-দেওয়া ইস্পাতের চাকচিক্য। ক্ষিতীশ সাহিত্যিক। চেহারায় খুঁত আছে, কিন্তু গল্প লেখায় খ্যাতনামা। পার্টি জমেছে সুষমা সেনদের বাগানে।

বাঁশরী

ক্ষিতীশ, সাহিত্যে তুমি নূতন ফ্যাশনের ধূমকেতু বললেই হয়। জ্বলন্ত ল্যাজের ঝাপটায় পুরোনো কায়দাকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলেছ আকাশ থেকে। যেখানে তোমাকে এনেছি এটা বিলিতি বাঙালি মহল, ফ্যাশনেব্‌ল্ পাড়া। পথঘাট তোমার জানা নেই। দেউড়িতে কার্ড তলব করলেই ঘেমে উঠতে। তাই সকাল সকাল আনলুম। আপাতত একটু আড়ালে বোসো। সকলে এলে প্রকাশ কোরো আপন মহিমা। এখন চললুম, হয়তো না আসতেও পারি।

ক্ষিতীশ

রোসো— একটু সমঝিয়ে দাও। অজায়গায় আমাকে আনা কেন ?

বাঁশরী

কথাটা খোলসা করে বলি তবে। বাজারে নাম করেছ বই লিখে। আরো উন্নতি আশা করেছিলুম। ভেবেছিলুম নামটাকে বাজার থেকে উদ্ধার করে এত উর্ধ্বে তুলবে যে, ইতর সাধারণ গাল পাড়তে থাকবে।

ক্ষিতীশ

আমার নামটা বাজারে-চলতি ঘষা পয়সা নয়, সে কথা কি স্বীকার কর না ?

বাঁশরী

সাহিত্যের সদর-বাজারের কথা হচ্ছে না, তোমরা যে নতুনবাজারের চলতি দরে ব্যাবসা চালাচ্ছ সেও একটা বাজার। তার বাইরে যেতে তোমার সাহস নেই পাছে মালের গুমোর কমে। এবারে তারই প্রমাণ পেলুম তোমার এই হালের বইটাতে যার নাম দিয়েছ 'বেমানান'। সস্তায় পাঠক ভোলাবার লোভ তোমার পুরো পরিমাণেই আছে। মাঝারি লেখকেরা মরে ঐ লোভে। তোমার এই বইটাকে বলি আধুনিকতার বটতলায় ছাপা, খেলো আধুনিকতা।

ক্ষিতীশ

কিঞ্চিৎ রাগ হয়েছে দেখছি; ছুরিটা বিঁধেছে তোমাদের ফ্যাশনেব্‌ল্ শার্ট্‌ফ্রন্ট্‌ ফুঁড়ে।

বাঁশরী

রামো! ছুরি বল ওকে! যাত্রার দলের কাঠের ছুরি, রাংতা মাখানো! ওতে যারা ভোলে তারা অজ্‌বুগ।

ক্ষিতীশ

আচ্ছা, মেনে নিলেম। কিন্তু আমাকে এখানে কেন?

বাঁশরী

তুমি টেবিল বাজিয়ে বাজনা অভ্যেস কর, যেখানে সত্যিকার বাজনা মেলে সেইখানে শিক্ষা দিতে নিয়ে এলুম। এদের কাছ থেকে দূরে থাক, ঈর্ষা কর, বানিয়ে দাও গাল। তোমার বইয়ে নলিনাক্ষের নামে যে দলকে সৃষ্টি করে লোক হাসিয়েছ সে দলের মানুষকে কি সত্যি করে জান?

ক্ষিতীশ

আদালতের সাক্ষীর মতো জানি নে, বানিয়ে বলবার মতো জানি।

বাঁশরী

বানিয়ে বলতে গেলে আদালতের সাক্ষীর চেয়ে অনেক বেশি জানা দরকার হয়, মশায়। যখন কলেজে পড়া মুখস্থ করতে তখন শিখেছিলে রসাত্মক বাক্যই কাব্য, এখন

সাবালক হয়েছ তবু ঐ কথাটা পুরিয়ে নিতে পারলে না যে, সত্যাত্মক বাক্য রসাত্মক হলেই তাকে বলে সাহিত্য।

ক্ষিতীশ

ছেলেমানুষি রুচিকে রস জোগাবার ব্যাবসা আমার নয়। আমি এসেছি জীর্ণকে চূর্ণ করে সাফ করতে।

বাঁশরী

বাস্ রে! আচ্ছা বেশ, কলমটাকে যদি ঝাঁটাই বানাতে চাও তা হলে আঁস্তাকুড়টা সত্যি হওয়া চাই, ঝাঁটাগাছটাও, আর সেই সঙ্গে ঝাড়ু-ব্যবসায়ীর হাতটাও। এই আমরাই তোমাদের নলিনাক্ষের দল, আমাদের অপরাধ আছে ঢের, তোমাদেরও আছে বিস্তর। কসুর মাপ করতে বলি নে, ভালো করে জানতে বলি, সত্যি করে জানাতে বলি, এতে ভালোই লাগুক মন্দই লাগুক কিছুই যায় আসে না।

ক্ষিতীশ

অন্তত তোমাকে তো জেনেছি, বাঁশি। কেমন লাগছে তারও আভাস আড়চোখে কিছু কিছু পাও বোধ করি।

বাঁশরী

দেখো সাহিত্যিক, আমাদের দলেও মানান-বেমানানের একটা নিক্তি আছে। চিটেগুড় মাখিয়ে কথাগুলোকে চট্‌চটে করে তোলা এখানে চলতি নেই। ওটাতে ঘেন্না

করে। শোনো ক্ষিতীশ, আর একবার তোমাকে স্পষ্ট করে বলি।

ক্ষিতীশ

এত অধিক স্পষ্ট তোমার কথা যে, যত বুঝি তার চেয়ে বাজে বেশি।

বাঁশরী

তা হোক, শোনো। অশ্বত্থামার ছেলেবেলাকার গল্প পড়েছ? ধনীর ছেলেকে ছুধ খেতে দেখে যখন সে কান্না ধরল তাকে পিটুলি গুলে খেতে দেওয়া হল, ছু হাত তুলে নাচতে লাগল 'ছুধ খেয়েছি' বলে।

ক্ষিতীশ

বুঝেছি, আর বলতে হবে না। অর্থাৎ আমার লেখায় পিটুলি-গোলা জল খাইয়ে পাঠক শিশুদের নাচাচ্ছি।

বাঁশরী

বানিয়ে-তোলা লেখা তোমার, বই পড়ে লেখা। জীবনে যার সত্যের পরিচয় আছে তার অমন লেখা বিস্বাদ লাগে।

ক্ষিতীশ

সত্যের পরিচয় আছে তোমার?

বাঁশরী

হাঁ আছে। ছুঃখ এই, লেখবার শক্তি নেই। তার চেয়ে

দুঃখের কথা— লেখবার শক্তি আছে তোমার, কিন্তু নেই সত্যের পরিচয়। আমি চাই, তুমি স্পষ্ট জানতে শেখ যেমন প্রত্যক্ষ করে আমি জেনেছি, সাঁচ্চা করে লিখতে শেখ। যাতে মনে হবে আমারই মন প্রাণ যেন তোমার কলমের মুখে ফুটে পড়ছে।

ক্ষিতীশ

জানার কথা তো বললে, জানবার পদ্ধতিটা কী ?

বাঁশরী

পদ্ধতিটা শুরু হোক আজকের এই পার্টিতে। এখানকার এই জগৎটার কাছ থেকে সেই পরিমাণে তুমি দূরে আছ যাতে এর সমস্তটাকে নির্লিপ্ত হয়ে দেখা সম্ভব।

ক্ষিতীশ

আচ্ছা তা হলে এই পার্টিটার একটা সরল ব্যাখ্যা দাও, একটা সিনপ্‌সিস্।

বাঁশরী

তবে শোনো— এক পক্ষে এই বাড়ির মেয়ে, নাম সুষমা সেন। পুরুষমাত্রেরই মত এই যে, ওর যোগ্য পাত্র জগতে নেই নিজে ছাড়া। উদ্ধত যুবকদের মধ্যে মাঝে মাঝে এমনতরো আস্তিন-গোটানো ভঙ্গী দেখি যাতে বোঝা যায় আইন-আদালত না থাকলে ওকে নিয়ে লোকক্ষয়কর কাণ্ড ঘটত। অপর পক্ষে শম্ভুগড়ের রাজা সোমশংকর।

মেয়েরা তার সম্বন্ধে কী কানাকানি করে বলব না, কারণ আমিও স্ত্রীজাতিরই অন্তর্গত। আজকের পার্টি এঁদের দোঁহাকার এন্‌গেজ্‌মেন্ট্‌ নিয়ে।

ক্ষিতীশ

দু-জন মানুষের ঠিকানা পাওয়া গেল। দুই সংখ্যাটা গড়ায় এসে সুশীতল গার্হস্থ্যে। তিন সংখ্যাটা নারদ, পাকিয়ে তোলে জটা, ঘটিয়ে তোলে তাপজনক নাট্য। এর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি কোথাও আছে নিশ্চয়, নইলে সাহিত্যিকের প্রলোভন কোথায়?

বাঁশরী

আছে তৃতীয় ব্যক্তি, সেই হয়তো প্রধান ব্যক্তি। লোকে তাকে ডাকে পুরন্দর সন্ন্যাসী। পিতৃদত্ত নামটার সন্ধান মেলে না। কেউ দেখেছে তাকে কুম্ভমেলায়, কেউ দেখেছে গারো পাহাড়ে ভালুক-শিকারে। কেউ বলে ও য়ুরোপে অনেক কাল ছিল। সুষমাকে কলেজের পড়া পড়িয়েছে আপন ইচ্ছায়। অবশেষে ঘটিয়েছে এই সম্বন্ধ। সুষমার মা বললেন, অনুষ্ঠানটা হোক ব্রাহ্মসমাজের কাউকে দিয়ে; সুষমা জেদ ধরলে একমাত্র পুরন্দর ছাড়া আর কাউকে দিয়ে চলবে না। চতুর্দিকের আবহাওয়াটার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, বলব, কোনো একটা জায়গায় ডিপ্রেশন ঘটেছে। গতিকটা ঝোড়ো রকমের; বাদলা কোনো-না-

কোনো পাড়ায় নেমেছে, বৃষ্টিপাত হয়তো স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। বাস্, আর নয়।

ক্ষিতীশ

ওই যাঃ, এই দেখো আমার এণ্ডির চাদরটাতে মস্ত একটা কালীর দাগ।

বাঁশরী

ব্যস্ত হও কেন। ঐ কালির দাগেই তোমার অসাধারণতা। তুমি রিয়ালিস্ট্, নির্মলতা তোমাকে মানায় না। তুমি মসীধ্বজ। ঐ আসছে অনসূয়া প্রিয়ম্বদা।

ক্ষিতীশ

তার মানে ?

বাঁশরী

দুই সখী। ছাড়াছাড়ি হবার জো নেই। বন্ধুত্বের উপাধি-পরীক্ষায় ঐ নাম পেয়েছে, আসল নামটা ভুলেছে সবাই।

উভয়ের প্রস্থান। দুই সখীর প্রবেশ

১

আজ সুষমার এন্‌গেজ্‌মেণ্ট্, মনে করতে কেমন লাগে।

২

সব মেয়েরই এন্‌গেজ্‌মেণ্টে মন খারাপ হয়ে যায়।

১

কেন ?

২

মনে হয় দড়ির উপরে চলছে, থর্ থর্ করে কাঁপছে সুখ-দুঃখের মাঝখানে। মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন ভয় করে।

১

তা সত্যি। আজ মনে হচ্ছে যেন নাটকের প্রথম অঙ্কের ড্রপ্‌সীন্ উঠল। নায়ক-নায়িকাও তেমনি, নাট্যকার নিজের হাতে সাজিয়ে চালান করেছেন রঙ্গভূমিতে। রাজা সোমশংকরকে দেখলে মনে হয় টডের রাজস্থান থেকে বেরিয়ে এল দুশো তিনশো বছর পেরিয়ে।

২

দেখিস নি প্রথম যখন এলেন রাজাবাহাদুর? খাঁটি মধ্যযুগের; ঝাঁকড়া চুল, কানে বীরবৌলি, হাতে মোটা কঙ্কণ, কপালে চন্দনের তিলক, বাংলা কথা খুব বাঁকা। পড়লেন বাঁশরীর হাতে, হল ওঁর মডার্‌ন্ সংস্করণ। দেখতে দেখতে যেরকম রূপান্তর ঘটল, কারো সন্দেহ ছিল না ওঁর গোত্রান্তর ঘটবে বাঁশরীর গুষ্টিতেই। বাপ প্রভুশংকর খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি আধুনিকের কবল থেকে নিয়ে গেলেন সরিয়ে।

১

বাঁশরীর চেয়ে বড়ো ওস্তাদ ঐ পুরন্দর সন্ন্যাসী, সব ক'টা বেড়া ডিঙিয়ে রাজার ছেলেকে টেনে নিয়ে এলেন এই ব্রাহ্মসমাজের আঙ্‌টি-বদলের সভায়। সব চেয়ে কঠিন বেড়া স্বয়ং বাঁশরীর।

সুষমার বিধবা মা বিভাসিনীর প্রবেশ। স্বল্পজলা বৈশাখী নদীর স্রোতঃপথে মাঝে মাঝে চর পড়ে যেরকম দৃশ্য হয় তেমনি চেহারা। শিথিল-বিস্তারিত দেহ, কিছু মাংসবহুল, তবু চাপা পড়ে নি যৌবনের ধারাবশেষ।

বিভাসিনী

বসে বসে কী ফিস ফিস করছিস তোরা?

১

মাসি, লোকজন আসবার সময় হল, সুষমার দেখা নেই কেন?

বিভাসিনী

কী জানি, হয়তো সাজগোজ চলছে। তোরা চল্‌ বাছা, চায়ের টেবিলের কাছে, অতিথিদের খাওয়াতে হবে।

১

যাচ্ছি মাসি, ওখানে এখনো রোদ্দুর।

বিভাসিনী

যাই দেখি গে সুষমা কী করছে। তাকে এখানে তোরা কেউ দেখিস নি?

২

না, মাসি।

বিভাসিনী

কে যে বললে ঐ পুকুরটার ধারে এসেছিল।

১

না, এতক্ষণ আমরাই ওখানে বেড়াচ্ছিলুম।

বিভাসিনীর প্রস্থান

২

চেয়ে দেখ্ ভাই, তোদের সুধাংশু কী খাটুনিই খাটছে। নিজের খরচে ফুল কিনে এনে টেবিল সাজিয়েছে নিজের হাতে। কাল এক কাণ্ড বাধিয়েছিল। নেপু বিশ্বাস মুখ বাঁকিয়ে বলেছিল সুষমা টাকার লোভে এক বুনো রাজাকে বিয়ে করছে।

১

নেপু বিশ্বেস! ওর মুখ বাঁকবে না? বুকের মধ্যে যে ধনুষ্টংকার! আজকাল সুষমাকে নিয়ে ছেলেদের দলে বুকজ্বলুনির লঙ্কাকাণ্ড। ঐ সুধাংশুর বুকখানা যেন মাড়োয়ারি জাহাজের বয়লার-ঘরের মতো হয়ে উঠেছে।

২

সুধাংশুর তেজ আছে, যেমন শোনা নেপুর কথা অমনি তাকে পেড়ে ফেললে মাটিতে, বুকের উপর চেপে বসে বললে, মাপ চেয়ে চিঠি লিখতে হবে।

১

দারুণ গোঁয়ার, ওর ভয়ে পেট ভরে কেউ নিন্দে করতেও পারে না। বাঙালির ছেলেদের বিষম কষ্ট।

২

জানিস নে আমাদের পাড়ায় বসেছে হতাশের সমিতি? লোকে যাদের বলে সুষমাভক্ত সম্প্রদায়, সৌষমিক যাদের উপাধি, তারা নাম নিয়েছে লক্ষ্মীছাড়ার দল। নিশেন বানিয়েছে, তাতে ভাঙাকুলোর চিহ্ন। সন্ধ্যাবেলায় কী চেঁচামেচি! পাড়ার গেরস্তরা বলছে কাউন্সিলে প্রস্তাব তুলবে আইন করে ধরে ধরে অবিলম্বে সব ক'টার জীবন্ত সমাধি অর্থাৎ বিয়ে দেওয়া চাই। নইলে রাত্তিরে ভদ্র-লোকদের ঘুম বন্ধ। পাব্লিক-ন্যুসেন্স যাকে বলে।

১

এই লোকহিতকর কার্যে তুই সাহায্য করতে পারবি, প্রিয়।

২

দয়াময়ী, লোকহিতৈষিতা তোমারও কোনো মেয়ের

চেয়ে কম নয়, ভাই। লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে লক্ষ্মী স্থাপন করবার শখ আছে তোমার। আন্দাজে তা বুঝতে পারি।— অনু, ঐ লোকটাকে চিনিস ?

১

কখনো তো দেখি নি।

২

ক্ষিতীশবাবু। গল্প লেখে, খুব নাম। বাঁশরী দামি জিনিসের বাজারদর বোঝে। ঠাট্টা করলে বলে, ঘোলের সাধ দুধে মেটাচ্ছি, মুক্তার বদলে শুক্তি।

১

চল্ ভাই, সবাই এসে পড়ল। আমাদের একত্র দেখলে ঠাট্টা করবে।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাগানের কোণে তিনটে ঝাউগাছ চক্র করে দাঁড়িয়ে। তলায় কাঠের আসন। সেই নিভৃতে ক্ষিতীশ। অন্যত্র নিমন্ত্রিতের দল কেউবা আলাপ করছে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে, কেউবা খেলছে টেনিস্, কেউবা টেবিলে সাজানো আহার্য ভোগ করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

শচীন

আই সে, তারক, লোকটা আমাদের এলাকায় পিল্‌পেগাড়ি করেছে, এর পরে পার্মনেণ্ট্ টেন্যুরের দাবি করবে। উচ্ছেদ করতে ফৌজদারি।

তারক

কার কথা বলছ ?

শচীন

ঐ যে নববার্তা কাগজের গল্প-লিখিয়ে ক্ষিতীশ।

তারক

ওর লেখা একটাও পড়ি নি, সেইজন্যে অসীম শ্রদ্ধা করি।

শচীন

পড় নি ওর নূতন বই 'বেমানান' ? বিলিতি-মার্কা নব্য বাঙালিকে মুচড়ে মুচড়ে নিংড়েছে।

অরুণ

দূরে বসে কলম চালিয়েছে, ভয় ছিল না মনে। কাছে এসেছে এইবারে বুঝবে, নিংড়ে ধবধবে সাদা করতে পারি আমরাও। তার পরে চড়াতে পারি গাধার পিঠে।

অর্চনা

ওর ছোঁওয়া বাঁচাতে চাও তোমরা, ওরই ভয় তোমাদের ছোঁওয়াকে। দেখছ না দূরে বসে আইডিয়ার ডিমগুলোতে তা দিচ্ছে ?

সতীশ

ও হল সাহিত্যরথী, আমরা পায়ে-হাঁটা পেয়াদা, মিলন ঘটবে কী উপায়ে ?

শচীন

ঘট্‌কী আছেন স্বয়ং তোমার বোন বাঁশরী। হাইব্রো দার্জিলিং আর ফিলিস্টাইন্ সিলিগুড়ি এর মধ্যে উনি রেললাইন পাতছেন। এখানে ক্ষিতীশের নেমন্তন্ন তাঁরই চক্রান্তে।

সতীশ

তাই নাকি! তা হলে ভগবানের কাছে হতভাগার আত্মার জন্যে শান্তি কামনা করি। আমার বোনকে এখনো চেনেন না।

শৈলবালা

তোমরা যা'ই বল, আমার কিন্তু ওর উপরে মায়া হয়।

সতীশ

কোন্ গুণে ?

শৈল

চেহারাতে। শুনেছি ছেলেবেলায় মায়ের বঁটির উপর পড়ে গিয়ে কপালে চোট লেগেছিল, তাই ঐ মস্ত কাটা দাগ। শরীরের খুঁত নিয়ে ওকে যখন ঠাট্টা কর, আমার ভালো লাগে না।

শচীন

মিস্ শৈল, বিধাতা তোমাকে নিখুঁত করেছেন তাই এত করুণা। কলির কোপ আছে যার চেহারায়, সে বিধাতার অকৃপার শোধ তুলতে চায় বিশ্বের উপর। তার হাতে কলম যদি সরু করে কাটা থাকে তা হলে শত হস্ত দূরে থাকা শ্রেয়। ইংরেজ কবি পোপের কথা মনে রেখো।

শৈল

আহা, তোমরা বাড়াবাড়ি করছ।

সতীশ

শৈল, তোমার দরদ দেখে নিজেরই কপালে বঁটি মারতে ইচ্ছে করছে। শাস্ত্রে আছে মেয়েদের দয়া আর ভালোবাসা থাকে এক মহলে, ঠাঁই বদল করতে দেরি হয় না।

শচীন

তোমার ভয় নেই সতীশ, মেয়েরা অযোগ্যকেই দয়া করে।

শৈল

আমাকে তাড়াতে চাও এখান থেকে।

শচীন

সতীশ সেই অপেক্ষাই করছে। ও যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

শৈল

রাগিয়ো না বলছি, তা হলে তোমার কথাও ফাঁস করে দেব।

শচীন

জেনে নাও বন্ধুগণ, আমারও ফাঁস করবার যোগ্য খবর আছে।

সতীশ

মিস্ বাণী, দেখছ লোকটার স্পর্ধা। গুজবটাকে ঠেলে আনছে তোমার দিকে। পাশ কাটাতে না পারলে অ্যাক্সিডেন্ট্ অনিবার্য।

লীলা

মিস্ বাণীকে সাবধান করতে হবে না। ও জানে তাড়া লাগালেই বিপদকে খেদিয়ে আনা হয়। তাই

চুপচাপ আছে, কপালে যা থাকে। ঐ যে কী গানটা ?—
'বলেছিল ধরা দেব না'।

গান

বলেছিল ধরা দেব না, শুনেছিল সেই বড়াই।
বীরপুরুষের সয় নি গুমোর, বাধিয়ে দিয়েছে লড়াই।
তার পরে শেষে কী যে হল কার,
কোন দশা হল জয়পতাকার,
কেউ বলে জিত, কেউ বলে হার, আমরা গুজব ছড়াই।

অর্চনা

আঃ, কেন তোরা বাণীকে নিয়ে পড়েছিস ? ও এখনি কেঁদে ফেলবে। সুষীমা, যা তো ক্ষিতীশবাবুকে ডেকে আন্ চা খেতে।

লীলা

হায় রে কপাল ! মিথ্যে ডাকবে, চোখ নেই দেখতে পাও না !

সতীশ

কেন, দেখবার কী আছে ?

লীলা

ঐ যে এণ্ডি চাদরের কোণে মস্ত একটা কালীর দাগ। ভেবেছেন চাপা দিয়েছেন কিন্তু ঝুলে পড়েছে।

সতীশ

আচ্ছা চোখ যা হোক তোমার।

লীলা

বোমা-তদন্তে পুলিশ না এলে ওঁকে নড়ায় কার সাধ্যি।

সতীশ

আমার কিন্তু ভয় হয়, কোনদিন বাঁশরী ঐ জখ্মি মানুষকে বিয়ে করে পরিবারের মধ্যে আতুরাশ্রম খুলে বসে।

লীলা

কী বল তার ঠিক নেই। বাঁশরীর জন্যে ভয়! ওর একটা গল্প বলি, ভয় ভাঙবে শুনে। আমি উপস্থিত ছিলুম।

শচীন

কী মিছে তাস খেলছ তোমরা! এসো এখানে, গল্প-লিখিয়ের উপর গল্প! শুরু করো।

লীলা

সোমশংকর হাত-ছাড়া হবার পরে বাঁশরীর শখ গেল নখী দন্তী গোছের একটা লেখক পোষবার। হঠাৎ দেখি জোটাল কোথা থেকে আস্ত একজন কাঁচা সাহিত্যিক। সেদিন উৎসাহ পেয়ে লোকটা শোনাতে এসেছে একটা নূতন লেখা। জয়দেব পদ্মাবতীকে নিয়ে তাজা গল্প। জয়দেব দূর থেকে ভালোবাসে রাজমহিষী পদ্মাবতীকে। রাজবধূর

যেমন রূপ তেমনি সাজসজ্জা, তেমনি বিদ্যেসাধ্যি। অর্থাৎ একালে জন্মালে সে হত ঠিক তোমারি মতো, শৈল। এ দিকে জয়দেবের স্ত্রী ষোলো আনা গ্রাম্য, ভাষায় পানা-পুকুরের গন্ধ, ব্যবহারটা প্রকাশ্যে বর্ণনা করবার মতো নয়, যে-সব তার বীভৎস প্রবৃত্তি ড্যাশ্ দিয়ে ফুট্‌কি দিয়েও তার উল্লেখ চলে না। লেখক শেষকালটায় খুব কালো কালীতে দেগে প্রমাণ করেছে যে, জয়দেব স্নব্, পদ্মাবতী মেকি, একমাত্র খাঁটি সোনা মন্দাকিনী। বাঁশরী চৌকি ছেড়ে দাঁড়িয়ে তারস্বরে বলে উঠল, 'মাস্‌টর্‌পীস্!' ধন্যি মেয়ে! একেবারে সাব্লাইম্ ন্যাকামি!

শচীন

মানুষটা চুপ্‌সে চ্যাপ্টা হয়ে গেল বোধ হয়?

লীলা

উল্টো। বুক উঠল ফুলে। বললে, 'শ্রীমতী বাঁশরী, মাটি খোঁড়বার কোদালকে আমি খনিত্র নাম দিয়ে শুদ্ধ করে নিই নে, তাকে কোদালই বলি।' বাঁশরী বলে উঠল, 'তোমার খেতাব হওয়া উচিত— নব্যসাহিত্যের পূর্ণচন্দ্র, কলঙ্কগর্বিত।' ওর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় যেন আতস-বাজির মতো।

শচীন

এটাও লোকটার গলা দিয়ে গলল? বাধল না?

লীলা

একটুও না। চায়ের পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে ভাবল, আশ্চর্য করেছি, এবার মুগ্ধ করে দেব। বললে, 'শ্রীমতী বাঁশরী, আমার একটা থিয়োরি আছে। দেখে নেবেন একদিন ল্যাবরেটারিতে তার প্রমাণ হবে। মেয়েদের জৈবকণায় যে এনার্জি থাকে সেটা ব্যাপ্ত সমস্ত পৃথিবীর মাটিতে। নইলে পৃথিবী হত বন্ধ্যা।' আমাদের সর্দার নেকি শুনেই এতখানি চোখ করে বললে, 'মাটিতে! বলেন কী, ক্ষিতীশবাবু! মেয়েদের মাটি করবেন না। মাটি তো পুরুষ। পঞ্চভূতের কোঠায় মেয়ে যদি কোথাও থাকে সে জলে। নারীর সঙ্গে মেলে বারি। স্থূল মাটিতে সূক্ষ্ম হয়ে সে প্রবেশ করে, কখনো আকাশ থেকে নামে বৃষ্টিতে, কখনো মাটির তলা থেকে ওঠে ফোয়ারায়, কখনো কঠিন হয় বরফে, কখনো ঝরে পড়ে ঝরনায়।' যা বলিস ভাই শৈল, বাঁশি কোথা থেকে কথা আনে জুটিয়ে, ভগীরথের গঙ্গার মতো হাঁপ ধরিয়ে দিতে পারে ঐরাবত হাতিটাকে পর্যন্ত।

শচীন

ক্ষিতীশ সেদিন ভিজে কাদা হয়ে গিয়েছিল বলো!

লীলা

সম্পূর্ণ। বাঁশি আমার দিকে ফিরে বললে, 'তুই তো

এম্‌-এস্‌সিতে বায়োকেমেস্ট্রি নিয়েছিস। শুনলি তো? বিশ্বে রমণীর রমণীয়তা যে অংশে সেইটিকে কেটে ছিঁড়ে পুড়িয়ে গুঁড়িয়ে হাইড্রলিক্‌ প্রেস দিয়ে দলিয়ে সল্‌ফ্যুরিক্‌ এসিড দিয়ে গলিয়ে তোকে রিসর্চে লাগতে হবে।' দেখো একবার দুষ্টুমি, আমি কোনো কালে বায়োকেমেস্ট্রি নিই নি। ওর পোষা জীবকে নাচাবার জন্যে চাতুরী। তাই বলছি ভয় নেই, মেয়েরা যাকে গাল দেয় তাকেও বিয়ে করতে পারে কিন্তু যাকে বিদ্রূপ করে তাকে নৈব নৈবচ। সব শেষে বোকাটা বললে, 'আজ স্পষ্ট বুঝলুম পুরুষ তেমনি করেই নারীকে চায় যেমন করে মরুভূমি চায় জলকে, মাটির তলার বোবা ভাষাকে উদ্ভিদ করে তোলবার জন্যে।' এত হেসেছি!

তারক

তুমি তো ঐ বললে। আমি একদিন ক্ষিতীশের তালি-দেওয়া মুখ নিয়ে একটু ঠাট্টার আভাস দিয়েছিলেম। বাঁশরী বলে উঠলেন, 'দেখো লাহিড়ী, ওর মুখ দেখতে আমার পজিটিভ্‌লি ভালো লাগে।' আমি আশ্চর্য হয়ে বললেম, 'তা হলে মুখখানা বিশুদ্ধ মডারন্‌ আর্ট্‌। বুঝতে ধাঁধাঁ লাগে।' ওর সঙ্গে কথায় কে পারবে? ও বললে, 'বিধাতার তূলিতে অসীম সাহস। যাকে ভালো দেখতে করতে চান তাকে সুন্দর দেখতে করা দরকার বোধ ক'রেন

না। তাঁর মিষ্টান্ন ছড়ান ইতর লোকদেরই পাতে।' বাই জোভ্, সূক্ষ্ম বটে!

শৈল

আর কি কোনো কথা নেই তোমাদের? ক্ষিতীশবাবু শুনতে পাবেন যে।

সতীশ

ভয় নেই, ওখানে ফোয়ারা ছুটছে, বাতাস উল্টোদিকে, শোনা যাবে না।

অর্চনা

আচ্ছা, তোমরা সব তাস খেলো, টেনিস্ খেলতে যাও, ওই মানুষটার সঙ্গে হিসেব চুকিয়ে আসি গে।

অর্চনা প্লেটে খাবার সাজিয়ে নিয়ে গেল ক্ষিতীশের কাছে। দোহারা গড়নের দেহ, সাজে সজ্জায় কিছু অযত্ন আছে, হাসিখুশি ঢল্‌ঢলে মুখ, আয়ু পশ্চিমের দিকে এক ডিগ্রি হেলেছে।

অর্চনা

ক্ষিতীশবাবু, পালিয়ে বসে আছেন আমাদের কাছ থেকে তার মানে বুঝতে পারি কিন্তু খাবার টেবিলটাকে অস্পৃশ্য করলেন কোন দোষে? নিরাকার আইডিয়ায় আপনারা অভ্যস্ত, নিরাহার ভোজেও কি তাই? আমরা বঙ্গনারী বঙ্গসাহিত্যের সেবার ভার পেয়েছি যে দিকটাতে সে দিকে আপনাদের পাকযন্ত্র।

ক্ষিতীশ

দেবী, আমরা জোগাই রসাত্মক বাক্য, তা নিয়ে তর্ক ওঠে, আপনারা দেন রসাত্মক বস্তু; ওটা অন্তরে গ্রহণ করতে মতান্তর ঘটে না।

অর্চনা

কী চমৎকার! আমি যখন থালায় কেক সন্দেশ গোছাচ্ছিলুম আপনি ততক্ষণ কথাটা বানিয়ে নিচ্ছিলেন। সাতজন্ম উপোষ করে থাকলেও আমার মুখ দিয়ে এমন ঝক্‌ঝকে কথাটা বেরোত না। তা যাক গে, পরিচয় নেই, তবু এলুম কাছে, কিছু মনে করবেন না। পরিচয় দেবার মতো নেই বিশেষ কিছু। বালিগঞ্জ থেকে টালিগঞ্জে যাবার ভ্রমণবৃত্তান্তও কোনো মাসিকপত্রে আজ পর্যন্ত ছাপাই নি। আমার নাম অর্চনা সেন। ঐ যে অপরিচিত ছোটো মেয়েটি বেণী দুলিয়ে বেড়াচ্ছে আমি তারই অখ্যাত কাকী।

ক্ষিতীশ

এবার তা হলে আমার পরিচয়টা—

অর্চনা

বলেন কী! পাড়াগেঁয়ে ঠাওরালেন আমাকে? শেয়ালদ স্টেশনে কি গাইড্ রাখতে হয় চেঁচিয়ে জানাতে যে কলকাতা শহরটা রাজধানী! এই পরশুদিন পড়েছি আপনার 'বেমানান' গল্পটা। পড়ে হেসে মরি আর কি।

ও কী ! প্রশংসা শুনতে আজও আপনার লজ্জা বোধ হয় ? খাওয়া বন্ধ করলেন যে ? আচ্ছা, সত্যি বলুন, নিশ্চয় ঘরের লোক কাউকে লক্ষ্য করে লিখেছেন। রক্তের যোগ না থাকলে অমন অদ্ভুত সৃষ্টি বানানো যায় না। ঐ যে, যে জায়গাটাতে মিস্‌টার্‌ কিষেন গাপ্টা বি-এ ক্যান্টাব্‌ মিস্‌ লোটিকার পিঠের দিকের জামার ফাঁক দিয়ে আঙ্‌টি ফেলে দিয়ে খানাতল্লাসির দাবি করে হোহা বাধিয়ে দিলে। আমার বন্ধুরা সবাই পড়ে বললে, 'ম্যাচ্‌লেস্‌, বঙ্গসাহিত্যে এ জায়গাটার দেশলাই মেলে না, একটু পোড়া কাঠিও না।' আপনার লেখা ভয়ানক রিয়লিস্‌টিক্‌, ক্ষিতীশবাবু। ভয় হয় আপনার সামনে দাঁড়াতে।

ক্ষিতীশ

আমাদের দু-জনের মধ্যে কে বেশি ভয়ঙ্কর, বিচার করবেন বিধাতাপুরুষ।

অর্চনা

না, ঠাট্টা করবেন না। সিঙাড়াটা শেষ করে ফেলুন। আপনি ওস্তাদ, ঠাট্টায় আপনার সঙ্গে পারব না। মোস্ট্‌ ইন্টারেস্‌টিং আপনার বইখানা। এমন সব মানুষ কোথাও দেখা যায় না। ঐ যে মেয়েটা কী তার নাম— কথায় কথায় হাঁপিয়ে উঠে বলে 'মাই আইজ্‌', 'ও গড্‌'—লাজুক ছেলে স্যাণ্ডেলের সঙ্কোচ ভাঙবার জন্যে নিজে মোটর হাঁকিয়ে

ইচ্ছে করে গাড়িটা ফেললে খাদে, মৎলব ছিল স্যাণ্ডেলকে দুই হাতে তুলে পতিতোদ্ধার করবে। হবি তো হ স্যাণ্ডেলের হাতে হল কম্পউণ্ড ফ্র্যাক্‌চার্‌। কী ড্রামাটিক্‌, রিয়ালিজ্‌মের চূড়ান্ত! ভালোবাসার এতবড়ো আধুনিক পদ্ধতি বেদব্যাসের জানা ছিল না। ভেবে দেখুন, সুভদ্রার কত বড়ো চান্স্‌ মারা গেল, আর অর্জুনেরও কব্জি গেল বেঁচে।

ক্ষিতীশ

কম মডার্‌ন্‌ নন আপনি। আমার মতো নির্লজ্জকেও লজ্জা দিতে পারেন।

অর্চনা

দোহাই ক্ষিতীশবাবু, বিনয় করবেন না। আপনি নির্লজ্জ! লজ্জায় গলা দিয়ে সন্দেশ গলছে না। কলমটার কথা স্বতন্ত্র।

লীলা

(কিছু দূর থেকে) অর্চনা মাসি, সময় হয়ে এল, ডাক পড়েছে।

অর্চনা

(জনান্তিকে) লীলা, আধমরা করেছি, বাকিটুকু তোর হাতে।

অর্চনার প্রস্থান

লীলা সাহিত্যে ফার্স্ট্ক্লাস্ এম্-এ ডিগ্রি নিয়ে আবার সায়েন্স্ ধরেছে। রোগা শরীর, ঠাট্টা তামাসায় তীক্ষ্ণ, সাজগোছে নিপুণ, কটাক্ষে দেখবার অভ্যাস।

লীলা

ক্ষিতীশবাবু, নমস্কার! আপনি 'সর্বত্র পূজ্যতে'র দলে। লুকোবেন কোথায়, পূজারি আপনাকে খুঁজে বের করে নিজের গরজে। এনেছি অটোগ্রাফের খাতা। সুযোগ কি কম!

কী লিখলেন দেখি। 'অন্য-সকলের মতো নয় যে-মানুষ তার মার অন্য-সকলের হাতে।' চমৎকার, কিন্তু প্যাথেটিক্। মারে ঈর্ষা ক'রে। মনে রাখবেন, ছোটো যারা তাদের ভক্তিরই একটা ইডিয়ম্ ঈর্ষা, মারটা তাদের পূজা।

ক্ষিতীশ

বাগ্বাদিনীর জাতই বটে, কথায় আশ্চর্য করে দিলেন।

লীলা

বাচস্পতির জাত যে আপনারা। যেটা বললেম ওটা কোটেশন। পুরুষের লেখা থেকেই। আপনাদের প্রতিভা বাক্য-রচনায়, আমাদের নৈপুণ্য বাক্য-প্রয়োগে। ওরিজিন্যালিটি আপনার বইএর পাতায় পাতায়। সেদিন আপনারই লেখা গল্পের বই পড়লেম। ব্রীলিয়েন্ট্। ঐ যে যাতে একজন মেয়ের কথা আছে— সে যখন দেখলে স্বামীর মন আর-এক জনের উপরে, বানিয়ে চিঠি লিখলে,

স্বামীর কাছে প্রমাণ করে দিলে যে সে ভালোবাসে তাদের প্রতিবেশী বামনদাসকে। আশ্চর্য সাইকলজির ধাঁধা। বোঝা শক্ত স্বামীর মনে ঈর্ষা জাগাবার এই ফন্দী না তাকে নিষ্কৃতি দেবার ঔদার্য।

ক্ষিতীশ

না না, আপনি ওটা—

লীলা

বিনয় করবেন না। এমন ওরিজিন্যাল্ আইডিয়া, এমন ঝক্‌ঝকে ভাষা, এমন চরিত্রচিত্র আপনার আর কোনো লেখায় দেখি নি। আপনার নিজের রচনাকেও বহু দূরে ছাড়িয়ে গেছেন। ওতে আপনার মুদ্রাদোষগুলো নেই, অথচ—

ক্ষিতীশ

ভুল করছেন আপনি। 'রক্তজবা'— ও বইটা যতীন ঘটকের।

লীলা

বলেন কী! ছি, ছি, এমন ভুলও হয়! যতীন ঘটককে যে আপনি রোজ দু-বেলা গাল দিয়ে থাকেন। আমার এ কী বুদ্ধি! মাপ করবেন আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ। আপনার জন্যে আর-এক পেয়ালা চা পাঠিয়ে দিচ্ছি— রাগ করে ফিরিয়ে দেবেন না।

লীলার প্রস্থান

রাজাবাহাদুর সোমশংকরের প্রবেশ। রাঘুবংশিক চেহারা 'শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ' রৌদ্রে পুড়ে ঈষৎ ম্লান গৌরবর্ণ, ভারি মুখ, দাড়ি গোঁফ কামানো, চুড়িদার সাদা পায়জামা, চুড়িদার সাদা আচ্‌কান, সাদা মস্‌লিনের পাঞ্জাবী কায়দার পাগড়ি, শুঁড়তোলা সাদা নাগরা জুতো, দেহটা যে ওজনের কণ্ঠস্বরটাও তেমনি।

সোমশংকর

ক্ষিতীশবাবু, বসতে পারি কি?

ক্ষিতীশ

নিশ্চয়।

সোমশংকর

আমার নাম সোমশংকর সিং। আপনার নাম শুনেছি মিস্ বাঁশরীর কাছ থেকে। তিনি আপনার ভক্ত।

ক্ষিতীশ

বোঝা কঠিন। অন্তত ভক্তিটা অবিমিশ্র নয়। তার থেকে ফুলের অংশ ঝরে পড়ে, কাঁটাগুলো দিনরাত থাকে বিঁধে।

সোমশংকর

আমার দুর্ভাগ্য আপনার বই পড়বার অবকাশ পাই নি। তবু আমাদের এই বিশেষ দিনে আপনি এখানে এসেছেন, বড়ো কৃতজ্ঞ হলুম। কোনো এক সময়ে আমাদের শম্ভুগড়ে আসবেন এই আশা রইল। জায়গাটা আপনার মতো সাহিত্যিকের দেখবার যোগ্য।

বাঁশরী

(পিছন থেকে এসে) ভুল বলছ শংকর, যা চোখে দেখা যায় তা উনি দেখেন না। ভূতের পায়ের মতো ওঁর চোখ উল্টো দিকে। সে কথা যাক। শংকর ব্যস্ত হোয়ো না। এখানে আজ আমার নেমন্তন্ন ছিল না। ধরে নিচ্ছি সেটা আমার গ্রহের ভুল নয় গৃহকর্তাদেরই ভুল। সংশোধন করতে এলুম। আজ সুষমার সঙ্গে তোমার এন্‌গেজ্‌মেণ্টের দিন অথচ এ সভায় আমি থাকব না এ হতেই পারে না। খুশি হও নি অনাহূত এসেছি বলে?

সোমশংকর

খুব খুশি হয়েছি, সে কি বলতে হবে?

বাঁশরী

সেই কথাটা ভালো করে বলবার জন্যে একটু বোসো এখানে। ক্ষিতীশ, ঐ চাঁপাগাছটার তলায় কিছুক্ষণ অদ্বিতীয় হয়ে থাকো গে। আড়ালে তোমার নিন্দে করব না।

ক্ষিতীশের প্রস্থান

শংকর, সময় বেশি নেই, কাজের কথাটি সেরে এখনি ছুটি দেব। তোমার নূতন এন্‌গেজ্‌মেণ্টের রাস্তায় পুরোনো জঞ্জাল কিছু জমে আছে। সাফ করে ফেললে সুগম হবে পথ। এই নাও।

বাঁশরী রেশমের থলি থেকে একটা পান্নার কণ্ঠী, হীরের ব্রেসলেট্, মুক্তোবসানো ব্রোচ্ বের করে দেখিয়ে আবার থলিতে পুরে সোমশংকরের কোলে ফেলে দিলে।

সোমশংকর

বাঁশি, তুমি জান আমার মুখে কথা জোগায় না। যা বলতে পারলেম না তার মানে নিজে বুঝে নিয়ো।

বাঁশরী

সব কথাই আমার জানা, মানে আমি বুঝি। এখন যাও, তোমাদের সময় হল।

সোমশংকর

যেয়ো না, বাঁশি। ভুল বুঝো না আমাকে। আমার শেষ কথাটা শুনে যাও। আমি জঙ্গলের মানুষ। শহরে এসে কলেজে পড়ার আরম্ভের মুখে প্রথম তোমার সঙ্গে দেখা। সে দৈবের খেলা। তুমিই আমাকে মানুষ করে দিয়েছিলে, তার দাম কিছুতেই শোধ হবে না। তুচ্ছ এই গয়নাগুলো।

বাঁশরী

আমার শেষ কথাটা শোনো শংকর। আমার তখন প্রথম বয়েস, তুমি এসে পড়লে সেই নতুন-জাগা অরুণ রঙের দিগন্তে। ডাক দিয়ে আলোয় আনলে যাকে, তাকে লও বা না লও নিজে তো তাকে পেলুম। আত্মপরিচয় ঘটল।

বাস্, তুই পক্ষে হয়ে গেল শোধবোধ। এখন তু-জনেই অঋণী হয়ে আপন আপন পথে চললুম। আর কী চাই।

সোমশংকর

বাঁশি, যদি কিছু বলতে যাই নির্বোধের মতো বলব। বুঝলুম আমার আসল কথাটা বলা হবে না কোনোদিনই। আচ্ছা তবে থাক্।··· অমন চুপ করে আমার দিকে চেয়ে আছ কেন? মনে হচ্ছে তুই চোখ দিয়ে আমাকে লুপ্ত করে দেবে।

বাঁশরী

আমি তাকিয়ে দেখছি একশো বছর পরেকার যুগান্তে। সে দিকে আমি নেই, তুমি নেই, আজকের দিনের অন্য কেউ নেই। ভুল বোঝার কথা বলছ! সেই ভুল বোঝার উপর দিয়ে চলে যাবে কালের রথ। ধুলো হয়ে যাবে, সেই ধুলোর উপরে বসে খেলা করবে তোমার নাতি নাৎনীরা। সেই নির্বিকার ধুলোর হোক জয়।

সোমশংকর

এ গয়নাগুলোর কোথাও স্থান রইল না; যাক তবে। (ফেলে দিলে ফোয়ারার জলাশয়ে।)

সুষমার বোন সুষীমার প্রবেশ। ফ্রক্ পরা, চষমা চোখে, বেণী দোলানো, দ্রুতপদে-চলা এগারো বছরের মেয়ে।

সুষীমা

সন্ন্যাসী-বাবা আসছেন, শংকরদা। তোমাকে ডেকে পাঠালেন সবাই। তুমি আসবে না, বাঁশিদিদি ?

বাঁশরী

আসব বৈ কি, আসার সময় হোক আগে। (সোমশংকর ও সুষীমার প্রস্থান) ক্ষিতীশ, শুনে যাও। চোখ আছে ? দেখতে পাচ্ছ কিছু কিছু ?

ক্ষিতীশ

রঙ্গভূমির বাইরে আমি। আওয়াজ পাচ্ছি, রাস্তা পাচ্ছি নে।

বাঁশরী

বাংলা উপন্যাসে নিয়ুমার্কেটের রাস্তা খুলেছ নিজের জোরে, আলকাৎরা ঢেলে। এখানে পুতুলনাচের রাস্তাটা বের করতে তোমারও অফীশিয়াল্ গাইড্ চাই! লোকে হাসবে যে !

ক্ষিতীশ

হাসুক-না। রাস্তা না পাই, অমন গাইড্‌কে তো পাওয়া গেল।

বাঁশরী

রসিকতা ! সস্তা মিষ্টান্নের ব্যাবসা ! এজন্যে ডাকি নি তোমাকে ! সত্যি করে দেখতে শেখো, সত্যি করে লিখতে

শিখবে। চারি দিকে অনেক মানুষ আছে, অনেক অমানুষও আছে, ঠাহর করলেই চোখে পড়বে। দেখো দেখো, ভালো করে দেখো।

ক্ষিতীশ

নাই বা দেখলেম, তোমার তাতে কী?

বাঁশরী

নিজে লিখতে পারি নে যে, ক্ষিতীশ। চোখে দেখি, মনে বুঝি, স্বর বন্ধ, ব্যর্থ হয় যে সব। ইতিহাসে বলে, একদিন বাঙালি কারিগরদের বুড়ো আঙুল দিয়েছিল কেটে। আমিও কারিগর, বিধাতা বুড়ো আঙুল কেটে দিয়েছেন। আমদানি করা মালে কাজ চালাই, পরখ করে দেখতে হয় সেটা সাঁচ্চা কি না। তোমরা লেখক, আমাদের মতো কলম-হারাদের জন্যেই কলমের কাজ তোমাদের।

সুষমার প্রবেশ। দেখবামাত্র বিস্ময় লাগে। চেহারা সতেজ সবল সমুন্নত। রঙ যাকে বলে কনকগৌর, ফিকে চাঁপার মতো, কপাল নাক চিবুক যেন কুঁদে তোলা।

সুষমা

(ক্ষিতীশকে নমস্কার ক'রে) বাঁশি, কোণে লুকিয়ে কেন?

বাঁশরী

কুণো সাহিত্যিককে বাইরে আনবার জন্য। খনির

সোনাকে শাণে চড়িয়ে তার চেক্‌নাই বের করতে পারি, আগে থাকতেই হাতযশ আছে। জহরতকে দামী করে তোলে জহরী, পরের ভোগেরই জন্য, কী বল? সুষী, ইনিই ক্ষিতীশবাবু, জান বোধ হয়।

সুষমা

জানি বৈ কি। এই সেদিন পড়ছিলুম ওঁর 'বোকার বুদ্ধি' গল্পটা। কাগজে কেন এত গাল দিয়েছে বুঝতে পারলুম না।

ক্ষিতীশ

অর্থাৎ বইখানা গাল দেবার যোগ্য এতই কি ভালো!

সুষমা

ওরকম ধারালো কথা বলবার ভার বাঁশরী আর ঐ আমার পিস্‌তুতো বোন লীলার উপরে। আপনাদের মতো লেখকের বই সমালোচনা করতে ভয় করি, কেননা তাতে সমালোচনা করা হয় নিজেরই বিদ্যেবুদ্ধির। অনেক কথা বুঝতেই পারি নে। বাঁশরীর কল্যাণে আপনাকে কাছে পেয়েছি, দরকার হলে বুঝিয়ে নেব।

বাঁশরী

ক্ষিতীশবাবু ন্যাচার্‌ল্ হিস্ট্রী লেখেন গল্পের ছাঁচে। যেখানে জানা নেই, দগ্‌দগে রঙ লেপে দেন মোটা তুলি দিয়ে। রঙের আমদানি সমুদ্রের ও পার থেকে। দেখে দয়া

হল। বললুম, জীবজন্তুর সাইকলজির খোঁজে গুহা গহ্বরে যেতে যদি খরচে না কুলোয় অন্তত জুয়োলজিকালের খাঁচার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতে দোষ কী ?

সুষমা

তাই বুঝি এনেছ এখানে ?

বাঁশরী

পাপমুখে বলব কী করে ? তাই তো বটে ! ক্ষিতীশবাবুর হাত পাকা, মাল-মশলাও পাকা হওয়া চাই। যথাসাধ্য জোগাড় দেবার মজুরগিরি করছি।

সুষমা

ক্ষিতীশবাবু, একটু অবকাশ করে নিয়ে আমাদের ও দিকে যাবেন। মেয়েরা সদ্য আপনার বই কিনে আনিয়েছে সই নেবে বলে। সাহস করছে না কাছে আসতে। বাঁশি, ওঁকে একলা ঘিরে রেখে কেন অভিশাপ কুড়োচ্ছ ?

বাঁশরী

(উচ্চহাস্যে) সেই অভিশাপই তো মেয়েদের বর। সে তুমি জান। জয়যাত্রায় মেয়েদের লুটের মাল প্রতিবেশিনীর ঈর্ষা।

সুষমা

ক্ষিতীশবাবু, শেষ দরবার জানিয়ে গেলুম। গণ্ডি

পেরোবার স্বাধীনতা যদি থাকে একবার যাবেন ও দিকে।

সুষমার প্রস্থান

ক্ষিতীশ

কী আশ্চর্য ওঁকে দেখতে! বাঙালি ঘরের মেয়ে বলে মনেই হয় না। যেন এথীনা, যেন মিনর্ভা, যেন ব্রুন্‌হিল্‌ড্‌।

বাঁশরী

(তীব্রহাস্যে) হায় রে হায় যত বড়ো দিগ্‌গজ পুরুষই হোক-না কেন সবার মধ্যেই আছে আদিম যুগের বর্বর। হাড়-পাকা রিয়লিস্‌ট্‌ বলে দেমাক কর, ভাণ কর মন্তর মান না। লাগল মন্তর চোখের কটাক্ষে, একদম উড়িয়ে নিয়ে গেল মাইথলজির যুগে। আজও কচি মনটা রূপকথা আঁকড়িয়ে আছে। তাকে হিঁচড়িয়ে উজোন পথে টানাটানি করে মনের উপরের চামড়াটাকে করে তুলেছ কড়া। দুর্বল বলেই বলের এত বড়াই।

ক্ষিতীশ

সে কথা মাথা হেঁট করেই মানব। পুরুষ জাত দুর্বল জাত।

বাঁশরী

তোমরা আবার রিয়লিস্‌ট্‌! রিয়লিস্‌ট্‌ মেয়েরা। যত বড়ো স্থূল পদার্থ হও না, যা তোমরা তাই বলেই জানি

তোমাদের। পাঁকে ডোবা জলহস্তীকে নিয়ে ঘর যদি করতেই হয় তাকে ঐরাবত বলে রোমান্স্ বানাই নে। রঙ মাখাই নে তোমাদের মুখে। মাখি নিজে। রূপকথার খোকা সব! ভালো কাজ হয়েছে মেয়েদের! তোমাদের ভোলানো! পোড়া কপাল আমাদের! এথীনা! মিনর্ভা! মরে যাই! ওগো রিয়লিস্ট্, রাস্তায় চলতে যাদের দেখেছ পানওয়ালীর দোকানে, গড়েছ কালো মাটির তাল দিয়ে যাদের মূর্তি, তারাই সেজে বেড়াচ্ছে এথীনা মিনর্ভা।

ক্ষিতীশ

বাঁশি, বৈদিক কালে ঋষিদের কাজ ছিল মন্তর পড়ে দেবতা ভোলানো— যাঁদের ভোলাতেন তাঁদের ভক্তিও করতেন। তোমাদের যে সেই দশা। বোকা পুরুষদের ভোলাও তোমরা আবার পাদোদক নিতেও ছাড় না। এমনি করেই মাটি করলে এই জাতটাকে।

বাঁশরী

সত্যি, সত্যি, খুব সত্যি। ঐ বোকাদের আমরাই বসাই টঙের উপরে, চোখের জলে কাদামাখা পা ধুইয়ে দিই, নিজেদের অপমানের শেষ করি, যত ভোলাই তার চেয়ে ভুলি হাজার গুণে।

ক্ষিতীশ

এর উপায়?

বাঁশরী

লেখো, লেখো সত্যি করে, লেখো শক্ত করে। মন্তর নয়, মাইথলজি নয়, মিনর্ভার মুখোসটা ফেলে দাও টান মেরে। ঠোঁট লাল করে তোমাদের পানওয়ালী যে মন্তর ছড়ায় ঐ আশ্চর্য মেয়েও ভাষা বদলিয়ে সেই মন্তরই ছড়াচ্ছে। সামনে পড়ল পথ-চল্‌তি এক রাজা, শুরু করলে জাদু। কিসের জন্যে? টাকার জন্যে। শুনে রাখো— টাকা জিনিসটা মাইথলজির নয়, ওটা ব্যাঙ্কের,ওটা তোমাদের রিয়লিজ্‌মের কোঠায়।

ক্ষিতীশ

টাকার প্রতি দৃষ্টি আছে সেটা তো বুদ্ধির লক্ষণ, সেই সঙ্গে হৃদয়টাও থাকতে পারে।

বাঁশরী

আছে গো হৃদয় আছে। ঠিক জায়গায় খুঁজলে দেখতে পাবে পানওয়ালীরও হৃদয় আছে। কিন্তু মুনফা এক দিকে, হৃদয়টা আর-এক দিকে। এইটে যখন আবিষ্কার করবে তখনি জমবে গল্পটা। পাঠিকারা ঘোর আপত্তি করবে, বলবে মেয়েদের খেলো করা হল, অর্থাৎ তাদের মন্ত্রশক্তিতে বোকাদের মনে খট্‌কা লাগানো হচ্ছে। উঁচু দরের পুরুষ পাঠকও গাল পাড়বে। বল কী, তাদের মাইথলজির রঙ চটিয়ে দেওয়া! সর্বনাশ! কিন্তু ভয় কোরো না ক্ষিতীশ, রঙ

যখন যাবে জ্বলে, মন্ত্র পড়বে চাপা, তখনো সত্য থাকবে টিঁকে, শেলের মতো, শূলের মতো।

ক্ষিতীশ

শ্রীমতী সুষমার হৃদয়ের বর্তমান ঠিকানাটা জানতে পারি কি?

বাঁশরী

ঠিকানা বলতে হবে না, নিজের চোখেই দেখতে পাবে যদি চোখ থাকে। এখন চলো ঐ দিকে। ওরা টেনিস্ খেলা সেরে এসেছে। এখন আইস্ক্রীম্ পরিবেষণের পালা। বঞ্চিত হবে কেন?

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বাগানের এক দিক। খাবার-টেবিল ঘিরে বসে আছে তারক, শচীন, সুধাংশু, সতীশ ইত্যাদি।

তারক

বাড়াবাড়ি হচ্ছে সন্ন্যাসীকে নিয়ে। নাম পুরন্দর নয় সবাই জানে। আসল নাম ধরা পড়লেই বোকার ভিড় পাৎলা হয়ে যেত। দেশী কি বিদেশী তা নিয়েও মতভেদ। ধর্ম কী জিজ্ঞাসা করলে হেসে বলে, ধর্মটা এখনো মরে নি তাই তাকে নামের কোঠায় ঠেসে দেওয়া চলে না। সেদিন দেখি আমাদের হিমুকে গল্‌ফ্‌ শেখাচ্ছে। হিমুর জীবাত্মাটা কোনোমতে গল্‌ফের গুলির পিছনেই ছুটতে পারে, তার বেশি ওর দৌড় নেই, তাই সে ভক্তিতে গদ্‌গদ। মিস্‌টীরিয়স্‌ সাজের নানা মাল-মশলা জুটিয়েছে। আজ ওকে আমি এক্‌স্‌পোজ্‌ করব সবার সামনে, দেখে নিও।

সুধাংশু

প্রমাণ করবে তোমার চেয়ে যে বড়ো সে তোমার চেয়ে ছোটো!

সতীশ

আঃ সুধাংশু, মজাটা মাটি করিস কেন? পকেট বাজিয়ে ও বলছে ডক্যুমেণ্ট্‌ আছে। বের করুক-না, দেখি

কিরকম চীজ সেটা। ঐ যে সন্ন্যাসী, সঙ্গে আসছেন এঁরা সবাই।

পুরন্দরের প্রবেশ। ললাট উন্নত, জ্বলছে দুই চোখ, ঠোঁটে রয়েছে অনুচ্চারিত অনুশাসন, মুখের স্বচ্ছ রঙ পাণ্ডুর শ্যাম, অন্তর থেকে বিচ্ছুরিত দীপ্তিতে ধৌত। দাঁড়ি গোঁফ কামানো, সুডৌল মাথায় ছোটো করে ছাঁটা চুল, পায়ে নেই জুতো, তসরের ধুতি পরা, গায়ে খয়েরী রঙের ঢিলে জামা। সঙ্গে সুষমা, সোমশংকর, বিভাসিনী।

শচীন

সন্ন্যাসীঠাকুর, বলতে ভয় করি, কিন্তু চা খেতে দোষ কী?

পুরন্দর

কিছুমাত্র না। যদি ভালো চা হয়। আজ থাক্, এইমাত্র নেমন্তন্ন খেয়ে আসছি।

শচীন

নেমন্তন্ন আপনাকেও? লাঞ্চে নাকি? গ্রেট্ইস্টার্নে বোষ্টমের মোচ্ছব?

পুরন্দর

গ্রেট্ইস্টার্নেই যেতে হয়েছিল। ডাক্তার উইল্‌কক্সের ওখানে।

শচীন

ডাক্তার উইল্‌কক্স্! কী উপলক্ষ্যে!

পুরন্দর

যোগবাশিষ্ঠ পড়ছেন।

শচীন

বাস্ রে! ওহে তারক, এগিয়ে এসো না। কী যে বলছিলে?

তারক

এই ফোটোগ্রাফটা তো আপনার?

পুরন্দর

সন্দেহ মাত্র নেই।

তারক

মোগলাই সাজ, সামনে গুড়গুড়ি, পাশে দাড়ি-ওয়ালাটা কে? সুস্পষ্ট যাবনিক।

পুরন্দর

রোশেনাবাদের নবাব। ইরানীবংশীয়। তোমার চেয়ে এঁর আর্যরক্ত বিশুদ্ধ।

তারক

আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে যে!

পুরন্দর

দেখাচ্ছে তুর্কির বাদশার মতো। নবাবসাহেব

ভালোবাসেন আমাকে, আদর করে ডাকেন মুক্তিয়ার মিঞা, খাওয়ান এক থালায়। মেয়ের বিয়ে ছিল, আমাকে সাজিয়েছিলেন আপন বেশে।

তারক

মেয়ের বিয়েতে ভাগবত পাঠ ছিল বুঝি ?

পুরন্দর

ছিল পোলো খেলার টুর্নামেন্ট্। আমি ছিলুম নবাবসাহেবের আপন দলে।

তারক

কেমন সন্ন্যাসী আপনি ?

পুরন্দর

ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত। কোনো উপাধিই নেই, তাই সব উপাধিই সমান খাটে। জন্মেছি দিগম্বর বেশে, মরব বিশ্বাম্বর হয়ে। তোমার বাবা ছিলেন কাশীতে হরিহর তত্ত্বরত্ন, তিনি আমাকে যে নামে জানতেন সে নাম গেছে ঘুচে। তোমার দাদা রামসেবক বেদান্তভূষণ কিছুদিন পড়েছেন আমার কাছে বৈশেষিক। তুমি তারক লাহিড়ি, তোমার নাম ছিল বুকু, আজ শ্বশুরের সুপারিসে কক্স্‌হিল্ সাহেবের এটর্নি অফিসে শিক্ষানবিশ। সাজ বদলেছে তোমার, তারক নামের আদ্যক্ষরটা তবর্গ থেকে টবর্গে

চড়েছে। শুনেছি যাবে বিলেতে। বিশ্বনাথের বাহনের প্রতি দয়া রেখো।

তারক

ডাক্তার উইল্‌কক্সের কাছ থেকে কি ইণ্ট্রোডাক্‌শন্ চিঠি পাওয়া যেতে পারবে?

পুরন্দর

পাওয়া অসম্ভব নয়।

তারক

মাপ করবেন। (পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম)

বাঁশরী

সুষমার মাস্টারিতে আজ ইস্তফা দিতে এসেছেন?

পুরন্দর

কেন দেব? আরো একটি ছাত্র বাড়ল।

বাঁশরী

শুরু করাবেন মুগ্ধবোধের পাঠ? মুগ্ধতার তলায় ডুবেছে যে মানুষটা হঠাৎ তার বোধোদয় হলে নাড়ী ছাড়বে।

পুরন্দর

(কিছুক্ষণ বাঁশরীর মুখের দিকে তাকিয়ে) বৎসে, একেই বলে ধৃষ্টতা। (বাঁশরী মুখ ফিরিয়ে সরে গেল।)

বিভাসিনী

সময় হয়েছে। ঘরের মধ্যে সভা প্রস্তুত, চলুন সকলে।

সকলের ঘরে প্রবেশ। দরজা পর্যন্ত গিয়ে বাঁশরী থমকে দাঁড়াল।

ক্ষিতীশ

তুমি যাবে না ঘরে ?

বাঁশরী

সস্তা দরের সদুপদেশ শোনবার শখ আমার নেই।

ক্ষিতীশ

সদুপদেশ !

বাঁশরী

এই তো সুযোগ। পালাবার রাস্তা বন্ধ। জালিয়ান-ওয়ালাবাগের মার।

ক্ষিতীশ

আমি একবার দেখে আসি গে।

বাঁশরী

না। শোনো, প্রশ্ন আছে। সাহিত্যসম্রাট, গল্পটার মর্ম যেখানে, সেখানে পৌঁচেছে তোমার দৃষ্টি ?

ক্ষিতীশ

আমার হয়েছে অন্ধ-গোলাঙ্গুল ন্যায়। ল্যাজটা ধরেছি চেপে, বাকিটা টান মেরেছে আমাকে, কিন্তু চেহারা

রয়েছে অস্পষ্ট। মোট কথাটা এই বুঝেছি যে, সুষমা বিয়ে করবে রাজাবাহাদুরকে, পাবে রাজৈশ্বর্য, তার বদলে হাতটা দিতে প্রস্তুত, হৃদয়টা নয়।

বাঁশরী

তবে শোনো বলি। সোমশংকর নয় প্রধান নায়ক, এ কথা মনে রেখো।

ক্ষিতীশ

তাই নাকি? তা হলে অন্তত গল্পটার ঘাট পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও। তারপরে সাঁৎরিয়ে হোক, খেয়া ধরে হোক, পারে পৌঁছব।

বাঁশরী

হয়তো জানো পুরন্দর তরুণসমাজে বিনা মাইনেয় মাস্টারি করেন। পরীক্ষায় উৎরিয়ে দিতে অদ্বিতীয়। কড়া বাছাই করে নেন ছাত্র। ছাত্রী পেতে পারতেন অসংখ্য, কিন্তু বাছাইরীতি এত অসম্ভব কঠিন যে এতদিনে একটি মাত্র পেয়েছেন তার নাম শ্রীমতী সুষমা সেন।

ক্ষিতীশ

ছাত্রী যাদের ত্যাগ করেছেন তাদের কী দশা?

বাঁশরী

আত্মহত্যার সংখ্যা কত খবর পাই নি। এটা জানি তাদের অনেকেই চক্ষু মেলে চেয়ে আছে ঊর্ধ্বে।

ক্ষিতীশ

সেই চকোরীর দলে নাম লেখাও নি?

বাঁশরী

তোমার কী মনে হয়?

ক্ষিতীশ

আমার মনে হয় চকোরীর জাত তোমার নয়, তুমি মিসেস্ রাহুর পদের উমেদার। যাকে নেবে তাকে দেবে লোপ করে, শুধু চঞ্চু মেলে তাকিয়ে থাকা নয়।

বাঁশরী

ধন্য! নরনারীর ধাত বুঝতে পয়লা নম্বর, গোল্ড্ মেডালিস্ট্। লোকে বলে নারীস্বভাবের রহস্য ভেদ করতে হার মানেন স্বয়ং নারীর সৃষ্টিকর্তা পর্যন্ত, কিন্তু তুমি নারীচরিত্রচারণচক্রবর্তী, নমস্কার তোমাকে!

ক্ষিতীশ

(করজোড়ে) বন্দনা সারা হল এবার বর্ণনার পালা শুরু হোক।

বাঁশরী

এটা আন্দাজ করতে পার নি যে, সুষমা ঐ সন্ন্যাসীর ভালোবাসায় একেবারে শেষ পর্যন্ত তলিয়ে গেছে?

ক্ষিতীশ

ভালোবাসা না ভক্তি?

বাঁশরী

চরিত্রবিশারদ, লিখে রাখো, মেয়েদের যে ভালোবাসা পৌঁছয় ভক্তিতে সেটা তাদের মহাপ্রয়াণ, সেখান থেকে ফেরবার রাস্তা নেই। অভিভূত যে পুরুষ ওদের সমান প্ল্যাট্‌ফর্‌মে নামে সেই গরিবের জন্য থার্ড্‌ক্লাস্‌, বড়ো জোর ইণ্টার্‌মীডিয়েট্‌। সেলুন গাড়ি তো নয়ই। যে উদাসীন মেয়েদের মোহে হার মানল না, ওদের ভুজপাশের দিগ্‌বলয় এড়িয়ে যে উঠল মধ্যগগনে, দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলে মেয়েরা তারই উদ্দেশে দিল শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য। দেখো নি তুমি, সন্ন্যাসী যেখানে মেয়েদের সেখানে কী ঠেলাঠেলি ভিড়!

ক্ষিতীশ

তা হবে। কিন্তু তার উল্টোটাও দেখেছি। মেয়েদের বিষম টান একেবারে তাজা বর্বরের প্রতি। পুলকিত হয়ে ওঠে তাদের অপমানের কঠোরতায়, পিছন পিছন রসাতল পর্যন্ত যেতে রাজি।

বাঁশরী

তার কারণ মেয়েরা অভিসারিকার জাত। এগিয়ে গিয়ে যাকে চাইতে হয় তার দিকেই ওদের পুরো ভালোবাসা। ওদের উপেক্ষা তারই 'পরে দুর্বৃত্ত হবার মতো জোর নেই যার কিম্বা দুর্লভ হবার মতো তপস্যা।

ক্ষিতীশ

আচ্ছা, বোঝা গেল সন্ন্যাসীকে ভালোবাসে ঐ সুষমা। তার পরে?

বাঁশরী

সে কী ভালোবাসা! মরণের বাড়া! সংকোচ ছিল না কেননা একে সে ভক্তি বলেই জানত। পুরন্দর দূরে যেত আপন কাজে, সুষমা তখন যেত শুকিয়ে, মুখ হয়ে যেত ফ্যাকাসে। চোখে প্রকাশ পেত জ্বালা, মন শূন্যে শূন্যে খুঁজে বেড়াত কার দর্শন। বিষম ভাবনা হল মায়ের মনে। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাঁশি, কী করি?' আমার বুদ্ধির উপর তখন তাঁর ভরসা ছিল। আমি বললেম, 'দাও-না পুরন্দরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে।' তিনি তো আঁৎকে উঠলেন। বললেন, 'এমন কথা ভাবতেও পার?' তখন নিজেই গেলুম পুরন্দরের কাছে। সোজা বললুম, 'নিশ্চয়ই জানেন, সুষমা আপনাকে ভালোবাসে। ওকে বিয়ে করে উদ্ধার করুন বিপদ থেকে।' এমন করে মানুষটা তাকাল আমার মুখের দিকে, রক্ত জল হয়ে গেল। গম্ভীর সুরে বললে, 'সুষমা আমার ছাত্রী, তার ভার আমার 'পরে, আর আমার ভার তোমার 'পরে নয়।' পুরুষের কাছ থেকে এতবড়ো ধাক্কা জীবনে এই প্রথম। ধারণা ছিল সব পুরুষের 'পরেই সব মেয়ের আব্দার চলে, যদি নিঃসংকোচ

সাহস থাকে। দেখলুম দুর্ভেদ্য দুর্গও আছে। মেয়েদের সাংঘাতিক বিপদ সেই বন্ধ কপাটের সামনে, ডাকও আসে সেইখান থেকে, কপালও ভাঙে সেইখানটায়।

ক্ষিতীশ

আচ্ছা বাঁশি, সত্যি করে বলো সন্ন্যাসী তোমারও মনকে টেনেছিল কিনা।

বাঁশরী

দেখো, সাইকলজির অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বের মহলে কুলুপ-দেওয়া ঘর। নিষিদ্ধ দরজা না খোলাই ভালো, সদর মহলেই যথেষ্ট গোলমাল, সামলাতে পারলে বাঁচি। আজ যে পর্যন্ত শুনলে তার পরের অধ্যায়ের বিবরণ পাওয়া যাবে একখানা চিঠি থেকে। পরে দেখাব।

ক্ষিতীশ

ঘরের মধ্যে চেয়ে দেখো, বাঁশি। পুরন্দর আঙটি বদল করাচ্ছে। জানলার থেকে সুষমার মুখের উপর পড়েছে রোদের রেখা। স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, শান্ত মুখ, জল ঝরে পড়ছে দুই চোখ দিয়ে। বরফের পাহাড়ে যেন সূর্যাস্ত, গলে পড়ছে ঝরনা।

বাঁশরী

সোমশংকরের মুখের দিকে দেখো, সুখ না দুঃখ, বাঁধন পরছে না ছিঁড়ছে? আর পুরন্দর, সে যেন ঐ সূর্যেরই

আলো। তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রয়েছে লক্ষ যোজন দূরে, মেয়েটার মনে যে অগ্নিকাণ্ড চলছে তার সঙ্গে কোনো যোগই নেই। অথচ তাকে ঘিরে একটা জ্বলন্ত ছবি বানিয়ে দিলে।

ক্ষিতীশ

সুষমার 'পরে সন্ন্যাসীর মন এতই যদি নির্লিপ্ত তবে ওকেই বেছে নিলে কেন?

বাঁশরী

ও যে আইডিয়ালিস্‌ট্‌! বাস্‌ রে! এতবড়ো ভয়ংকর জীব জগতে নেই। আফ্রিকার অসভ্য মারে মানুষকে নিজে খাবে বলে। এরা মারে তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায়। খায় না খিদে পেলেও। বলি দেয় সারে সারে, জেঙ্গিস্‌খাঁর চেয়ে সর্বনেশে।

ক্ষিতীশ

সন্ন্যাসীর 'পরে তোমার মনে মনে ভক্তি আছে বলেই তোমার ভাষা এত তীব্র।

বাঁশরী

যাকে তাকে ভক্তি করতে না পেলে বাঁচে না যে-সব হ্যাংলা মেয়ে আমি তাদের দলে নই গো। রাজরানী যদি হতুম মেয়েদের চুলে দড়ি পাকিয়ে ওকে দিতুম ফাঁসি। কামিনী কাঞ্চন ছোঁয় না যে তা নয়; কিন্তু তাকে দেয় ফেলে

ওর কোন এক জগন্নাথের রথের তলায়, বুকের পাঁজর যায় গুঁড়িয়ে।

ক্ষিতীশ

ওর আইডিয়াটা কী জানা চাই তো।

বাঁশরী

সে আছে বাওয়ান্ন বাঁও জলের নীচে। তোমার এলাকার বাইরে, সেখানে তোমার মন্দাকিনী পদ্মাবতীর ডুব সাঁতার চলে না। আভাস পেয়েছি কোন ডাকঘর-বিবর্জিত দেশে ও এক সঙ্ঘ বানিয়েছে, তরুণ-তাপস-সঙ্ঘ, সেখানে নানা পরীক্ষায় মানুষ তৈরি হচ্ছে।

ক্ষিতীশ

কিন্তু, তরুণী ?

বাঁশরী

ওর মতে গৃহেই নারী, কিন্তু পথে নয়।

ক্ষিতীশ

তা হলে সুষমাকে কিসের প্রয়োজন ?

বাঁশরী

অন্ন চাই যে। মেয়েরা প্রহরণধারিণী না হোক বেড়িহাতা-ধারিণী তো বটে। রাজভাণ্ডারের চাবিটা থাকবে ওরই হাতে। ঐযে ওরা বেরিয়ে আসছে, অনুষ্ঠান শেষ হল বুঝি।

পুরন্দর ও অন্য সকলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

পুরন্দর

(সোমশংকর ও সুষমাকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে)
তোমাদের মিলনের শেষ কথাটা ঘরের দেয়ালের মধ্যে নয় বাইরে, বড়ো রাস্তার সামনে। সুষমা, বৎসে, যে সম্বন্ধ মুক্তির দিকে নিয়ে চলে তাকেই শ্রদ্ধা করি। যা বেঁধে রাখে পশুর মতো প্রকৃতির গড়া প্রবৃত্তির বন্ধনে বা মানুষের গড়া দাসত্বের শৃঙ্খলে ধিক্ তাকে। পুরুষ কর্ম করে, স্ত্রী শক্তি দেয়। মুক্তির রথ কর্ম, মুক্তির বাহন শক্তি। সুষমা, ধনে তোমার লোভ নেই তাই ধনে তোমার অধিকার। তুমি সন্ন্যাসীর শিষ্যা, তাই রাজার গৃহিণীপদে তোমার পূর্ণতা।
(ডান হাতে সোমশংকরের ডান হাত ধ'রে)

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।

ওঠো তুমি, যশোলাভ করো। শত্রুদের জয় করো— যে রাজ্য অসীম সমৃদ্ধিবান তাকে ভোগ করো। বৎস' আমার সঙ্গে আবৃত্তি করো প্রণামের মন্ত্র।

নমঃ পুরস্তাদ্ অথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোস্তুতে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ।

তোমাকে নমস্কার সম্মুখ থেকে, তোমাকে নমস্কার পশ্চাৎ থেকে, হে সর্ব, তোমাকে নমস্কার সর্ব দিক থেকে। অনন্তবীর্য তুমি, অমিতবিক্রম তুমি, তোমাতেই সর্ব, তুমিই সর্ব!

ক্ষণকালের জন্য যবনিকা পড়ে তখনি উঠে গেল। তখন রাত্রি, আকাশে তারা দেখা যায়। সুষমা ও তার বন্ধু নন্দা।

সুষমা

এইবার সেই গানটা গা দেখি, ভাই।

নন্দা

গান

না চাহিলে যারে পাওয়া যায়,
তেয়াগিলে আসে হাতে,
দিবসে সে ধন হারায়েছি আমি
পেয়েছি আঁধার রাতে।
না দেখিবে তারে পরশিবে না গো,
তারি পানে প্রাণ মেলে দিয়ে জাগো :
তারায় তারায় র'বে তারি বাণী,
কুসুমে ফুটিবে প্রাতে।
তারি লাগি যত ফেলেছি অশ্রুজল,
বীণাবাদিনীর শতদলদলে
করিছে সে টলমল।

মোর গানে গানে পলকে পলকে
ঝলসি উঠিছে ঝলকে ঝলকে,
শান্ত হাসির করুণ আলোক
ভাতিছে নয়নপাতে।

পুরন্দরের প্রবেশ

সুষমা

(ভূমিষ্ঠ প্রণাম ক'রে) প্রভু, দুর্বল আমি। মনের গোপনে যদি পাপ থাকে ধুয়ে দাও, মুছে দাও। আসক্তি দূর হোক, জয়যুক্ত হোক তোমার বাণী।

পুরন্দর

বৎসে, নিজেকে নিন্দা কোরো না, অবিশ্বাস কোরো না, নাত্মানমবসাদয়েৎ। ভয় নেই, কোনো ভয় নেই। আজ তোমার মধ্যে সত্যের আবির্ভাব হয়েছে মাধুর্যে, কাল সেই সত্য অনাবৃত করবে আপন জগজ্জয়িনী বীরশক্তি।

সুষমা

আজ সন্ধ্যায় এইখানে তোমার প্রসন্নদৃষ্টির সামনে আমার নূতন জীবন আরম্ভ হল। তোমারই পথ হোক আমার পথ।

পুরন্দর

তোমাদের কাছ থেকে দূরে যাবার সময় আসন্ন হয়েছে।

সুষমা

দয়া করো প্রভু, ত্যাগ কোরো না আমাকে। নিজের ভার আমি নিজে বহন করতে পারব না। তুমি চলে গেলে আমার সমস্ত শক্তি যাবে তোমারই সঙ্গে।

পুরন্দর

আমি দূরে গেলেই তোমার শক্তি তোমার মধ্যে ধ্রুব প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি তোমার হৃদয়দ্বার খুলে দিয়েছি নিজে স্থান নেব বলে নয়। যিনি আমার ব্রতপতি তিনি সেখানে স্থান গ্রহণ করুন। আমার দেবতা হোন তোমারই দেবতা। দুঃখকে ভয় নেই, আনন্দিত হও আত্মজয়ী আপনারই মধ্যে।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সোমশংকরের মহত্ত্ব তুমি আপন অন্তরের থেকে চিনতে পেরেছ?

সুষমা

পেরেছি।

পুরন্দর

সেই দুর্লভ মহত্ত্বকে তোমার দুর্লভ সেবার দ্বারা মূল্যদান করে গৌরবান্বিত করবে, তার বীর্যকে সর্বোচ্চ সার্থকতার দিকে আনন্দে উন্মুখ রাখবে, এই নারীর কাজ। মনে রেখো, তোমার দিকে তাকিয়ে সে যেন নিজেকে শ্রদ্ধা করতে পারে। এই কথাটি ভুলো না।

সুষমা

কখনো ভুলব না।

পুরন্দর

প্রাণকে নারী পূর্ণতা দেয় এই জন্যেই নারী মৃত্যুকেও মহীয়ান করতে পারে, তোমার কাছে এই আমার শেষ কথা।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চৌরঙ্গি-অঞ্চলে বাঁশরীদের বাড়ি। ক্ষিতীশ ও বাঁশরী

ক্ষিতীশ

তোমার হিন্দুস্থানী শোফার্‌টা ভোরবেলা মুহুর্মুহু বাজাতে লাগল গাড়ির ভেঁপু। চেনা আওয়াজ, ধড়্‌ফড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লুম।

বাঁশরী

ভোরবেলায়? অর্থাৎ?

ক্ষিতীশ

অর্থাৎ, আটটার কম হবে না।

বাঁশরী

অকালবোধন!

ক্ষিতীশ

দুঃখ নেই, তবু জানতে চাই কারণটা। কোনো কারণ না থাকলেও নালিশ করব না।

বাঁশরী

বুঝিয়ে বলছি। লেখবার বেলায় নলিনাক্ষের দল বলে যাদের দাগা দিয়েছ তাদের সামনে এলেই দেখি

তোমার মন যায় এতটুকু হয়ে। মনে মনে চেঁচিয়ে নিজেকে বোঝাতে থাক— ওরা তো ডেকোরেটেড্ ফূল্স্। কিন্তু সেই স্বগতোক্তিতে সংকোচ চাপা পড়ে না। সাহিত্যিক আভিজাত্যবোধকে অন্তরের মধ্যে ফাঁপিয়ে তোল তবু নিজেকে ওদের সমান বহরে দাঁড় করাতে পার না! সেই চিত্তবিক্ষেপ থেকে বাঁচাবার জন্য নলিনাক্ষদলের দিন আরম্ভ হবার পূর্বেই তোমাকে ডাকিয়েছি। সকাল বেলায় অন্তত ন'টা পর্যন্ত আমাদের এখানে রাতের উত্তরাকাণ্ড। আপাতত এ বাড়িটা সাহারা মরুভূমির মতো নির্জন।

ক্ষিতীশ

ওয়েসিস্ দেখতে পাচ্ছি এই ঘরটার সীমানায়।

বাঁশরী

ওগো পথিক, ওয়েসিস্ নয়, ভালো করে যখন চিনবে তখন বুঝবে মরীচিকা।

ক্ষিতীশ

আমার মাথায় আরও উপমা আসছে বাঁশি, আজ তোমার সকালবেলাকার অসজ্জিত রূপ দেখাচ্ছে যেন সকালবেলাকার অলস চাঁদের মতো।

বাঁশরী

দোহাই তোমার, গদগদ ভাবটা রেখে দিয়ো একলা

ঘরের বিজন বিরহের জন্য। মুগ্ধ দৃষ্টি তোমাকে মানায় না। কাজের জন্য ডেকেছি, বাজে কথা স্ট্রীক্ট্‌লি প্রোহিবিটেড্‌।

ক্ষিতীশ

এর থেকে ভাষার রেলেটিভিটি প্রমাণ হয়। আমার পক্ষে যা মর্মান্তিক জরুরী তোমার পক্ষে তা ঝেঁটিয়ে-ফেলা বাজে।

বাঁশরী

আজ সকালে এই আমার শেষ অনুরোধ, গাঁজিয়ে-ওঠা রসের ফেনা দিয়ে তাড়িখানা বানিয়ো না নিজের ব্যবহারটাকে। আর্টিস্টের দায়িত্ব তোমার।

ক্ষিতীশ

আচ্ছা তবে মেনে নিলুম দায়িত্ব।

বাঁশরী

সাহিত্যিক, হতাশ হয়ে পড়েছি তোমার অসাড়তা দেখে। নিজের চক্ষে দেখলে একটা আসন্ন ট্র্যাজেডির সংকেত— আগুনের সাপ ফণা ধরেছে, এখনো চেতিয়ে উঠল না তোমার কলম, আমার তো কাল সারারাত্রি ঘুম হল না। এমন লেখা লেখবার শক্তি কেন আমাকে দিলেন না বিধাতা যার অক্ষরে অক্ষরে ফেটে পড়ত রক্তবর্ণ আগুনের ফোয়ারা? দেখতে পাচ্ছি আর্টিস্টের চোখে, বলতে পারছি নে

আর্টিস্টের কণ্ঠে। ব্রহ্মা যদি বোবা হতেন তা হলে অস্ফুট বিশ্বের ব্যথায় মহাকাশের বুক যেত ফেটে।

ক্ষিতীশ

কে বলে তুমি প্রকাশ করতে পার না বাঁশি, তুমি নও আর্টিস্ট! তুমি যেন হীরেমুক্তোর হরির লুঠ দিচ্ছ। কথায় কথায় তোমার শক্তির প্রমাণ ছড়াছড়ি যায় দেখে ঈর্ষা হয় মনে।

বাঁশরী

আমি যে মেয়ে, আমার প্রকাশ ব্যক্তিগত। বলবার লোককে প্রত্যক্ষ পেলে তবেই বলতে পারি। কেউ নেই তবু বলা— সেই বলা তো চিরকালের। আমাদের বলা নগদ বিদায় হাতে হাতে দিনে দিনে। ঘরে ঘরে মুহূর্তে মুহূর্তে সেগুলো ওঠে আর মেলায়।

ক্ষিতীশ

পুরুষ আর্টিস্ট্‌কে এবার মেরেছ ঠেলা, আচ্ছা বেশ, কাজ আরম্ভ হোক। সেদিন বলেছিলে একটা চিঠির কথা।

বাঁশরী

এই সেই চিঠি। সন্ন্যাসী বলছেন— প্রেমে মানুষের মুক্তি সর্বত্র। কবিরা যাকে বলে ভালোবাসা সেইটাই বন্ধন। তাতে একজন মানুষকেই আসক্তির দ্বারা ঘিরে

নিবিড় স্বাতন্ত্র্যে অতিকৃত করে। প্রকৃতি রঙিন মদ ঢেলে দেয় দেহের পাত্রে, তাতে যে মাৎলামি তীব্র হয়ে ওঠে তাকে অপ্রমত্ত সত্যবোধের চেয়ে বেশি সত্য বলে ভুল হয়। খাঁচাকেও পাখি ভালোবাসে যদি তাকে আফিমের নেশার বশ করা যায়। সংসারে যত দুঃখ, যত বিরোধ, যত বিকৃতি সেই মায়া নিয়ে যাতে শিকলকে করে লোভনীয়। কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যে চিনতে যদি চাও তবে বিচার করে দেখো কোন্‌টাতে ছাড়া দেয় আর কোন্‌টা রাখে বেঁধে। প্রেমে মুক্তি, ভালোবাসায় বন্ধন।

ক্ষিতীশ

শুনলেম চিঠি, তার পরে?

বাঁশরী

তার পরে তোমার মাথা! অর্থাৎ তোমার কল্পনা। মনে মনে শুনতে পাচ্ছ না শিষ্যকে বলছেন, ভালোবাসা আমাকে নয়, অন্য কাউকেও নয়? নির্বিশেষ প্রেম, নির্বিকার আনন্দ, নিরাসক্ত আত্মনিবেদন, এই হল দীক্ষা-মন্ত্র।

ক্ষিতীশ

তা হলে এর মধ্যে সোমশংকর আসে কোথা থেকে?

বাঁশরী

প্রেমের সরকারী রাস্তায়, যে প্রেমে সকলেরই সমান

অধিকার খোলা হাওয়ার মতো। তুমি লেখক-প্রবর, তোমার সামনে সমস্যাটা এই যে, খোলা হাওয়ায় সোমশংকরের পেট ভরবে কি?

ক্ষিতীশ

কী জানি! সূচনায় তো দেখতে পাচ্ছি শূন্য-পুরাণের পালা।

বাঁশরী

কিন্তু শূন্যে এসে কি ঠেকতে পারে কিছু? শেষ মোকামে তো পৌঁছল গাড়ি, এ পর্যন্ত রথ চালিয়ে এলেন সন্ন্যাসী সারথি! আড্ডা-বদলের সময় যখন একদিন আসবে তখন লাগাম পড়বে কার হাতে? সেই কথাটা বলো-না রিয়লিস্ট্!

ক্ষিতীশ

যাকে ওরা নাক সিট্‌কে প্রকৃতি বলেন সেই মায়াবিনীর হাতে। পাখা নেই অথচ আকাশে উড়তে চায় যে স্থূল জীবটা তাকে যিনি ধপ করে মাটিতে ফেলে চট্‌কা দেন ভাঙিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে লাগিয়ে দেন ধুলো।

বাঁশরী

প্রকৃতির সেই বিদ্রূপটাকেই বর্ণনা করতে হবে তোমাকে। ভবিতব্যের চেহারাটা জোর কলমে দেখিয়ে দাও। বড়ো নিষ্ঠুর। সীতা ভাবলেন, দেবচরিত্র রামচন্দ্র

উদ্ধার করবেন রাবণের হাত থেকে, শেষকালে মানবপ্রকৃতি রামচন্দ্র চাইলেন তাঁকে আগুনে পোড়াতে। একেই বলে রিয়ালিজ্‌ম্, নোঙরামিকে নয়। লেখো লেখো, দেরি কোরো না, লেখো এমন ভাষায় যা হৃৎপিণ্ডের শিরাছেঁড়া ভাষা। পাঠকেরা চম্‌কে উঠে দেখুক এতদিন পরে বাংলার দুর্বল সাহিত্যে এমন একটা লেখা ফেটে বেরোল যা ঝোড়ো মেঘের বুকভাঙা সূর্যাস্তের রাগী আলোর মতো।

ক্ষিতীশ

ইস্, তোমার মনটা নেমেছে ভল্‌ক্যানোর জঠরাগ্নির মধ্যে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি— ওদের অবস্থায় পড়লে কী করতে তুমি?

বাঁশরী

সন্ন্যাসীর উপদেশ সোনার জলে বাঁধানো খাতায় লিখে রাখতুম। তার পরে প্রবৃত্তির জোর কলমে তার প্রত্যেক অক্ষরের উপর দিতুম কালীর আঁচড় কেটে। প্রকৃতি জাদু লাগায় আপন মন্ত্রে, সন্ন্যাসীও জাদু করতেই চায় উল্টো মন্ত্রে; ওর মধ্যে একটা মন্ত্র নিতুম মাথায় আর-একটা মন্ত্রে প্রতিদিন প্রতিবাদ করতুম হৃদয়ে।

ক্ষিতীশ

এখন কাজের কথা পাড়া যাক। ইতিহাসের গোড়ার

দিকটায় ফাঁক রয়েছে। ওদের বিবাহসম্বন্ধ সন্ন্যাসী ঘটাল কী উপায়ে?

বাঁশরী

প্রথমত সেনবংশ যে ক্ষত্রিয়, সেনানী শব্দ থেকে তার পদবীর উদ্ভব, ওরা যে কোনো-এক খৃস্ট-শতাব্দীতে এসেছিল কোনো-এক দক্ষিণপ্রদেশ থেকে দিগ্‌বিজয়ী-বাহিনীর পতাকা নিয়ে বাংলার কোনো-এক বিশেষ বিভাগে, সেইটে প্রমাণ করে লিখল এক সংস্কৃত পুঁথি। কাশীর দ্রাবিড়ী পণ্ডিত করলে তার সমর্থন। সন্ন্যাসী স্বয়ং গেল সোমশংকরদের রাজ্যে, প্রজারা হাঁ করে রইল ওর চেহারা দেখে, কানাকানি করতে লাগল কোনো-একটা দেব-অংশের ঝালাই দিয়ে এর দেহখানা তৈরি। সভাপণ্ডিত মুগ্ধ হল শৈবদর্শনব্যাখ্যায়। রাজাবাহাদুরের মনটা সাদা, দেহটা জোরালো, তাতে লাগল কিছু সন্ন্যাসীর মন্ত্র, কিছু লাগল প্রকৃতির মোহ। তার পরে এই যা দেখছ।

ক্ষিতীশ

হায় রে, সন্ন্যাসী কি আমাদের মতো অভাজনদের হয়ে স্থূল প্রকৃতির তরফে ঘটকালি করেন না!

বাঁশরী

রাখো তোমার ছিব্‌লেমি। ভুল করেছি তোমাকে নিয়ে যে মানুষ খাঁটি লিখিয়ে তার সামনে যখন দেখা

দিয়েছে সৃষ্টিকল্পনার এমন একটা জীবন্ত আদর্শ দব দব্‌ করছে যার নাড়ি, তার মুখ দিয়ে কি বেরোয় খেলো কথা? কেমন করে জাগাব তোমাকে? আমি যে প্রত্যক্ষ দেখছি একটা মহারচনার পূর্বরাগ, শুনছি তার অন্তহীন নীরস কান্না। দেখতে পাচ্ছ না অদৃষ্টের একটা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ? থাক্‌ গে, শেষ হল আমার কথা। তোমার খাবার পাঠিয়ে দিতে চললুম। (প্রস্থানোদ্যম)

ক্ষিতীশ

(ছুটে গিয়ে হাত চেপে ধরে) চাই নে খাবার। যেয়ো না তুমি।

বাঁশরী

(হাত ছিনিয়ে নিয়ে উচ্চহাস্যে) তোমার 'বেমানান' গল্পের নায়িকা পেয়েছ আমাকে! আমি ভয়ংকর সত্যি।

ড্রেসিংগাউন-পরা সতীশের প্রবেশ

সতীশ

উচ্চহাসির আওয়াজ শুনলুম যে।

বাঁশরী

উনি এতক্ষণ স্টেজের মুন্নুবাবুর নকল করছিলেন।

সতীশ

ক্ষিতীশবাবুর নকল আসে না কি?

বাঁশরী

আসে বৈ কি, ওঁর লেখা পড়লেই টের পাওয়া যায়। তুমি এঁর কাছে একটু বোসো, আমি ওঁর জন্য খাবার পাঠিয়ে দিই গে।

ক্ষিতীশ

দরকার নেই, কাজ আছে, দেরি করতে পারব না।

প্রস্থান

বাঁশরী

মনে থাকে যেন আজ বিকেলে সিনেমা— তোমারই পদ্মাবতী।

নেপথ্য হতে

সময় হবে না।

বাঁশরী

হবেই সময়, অন্য দিনের চেয়ে দু ঘণ্টা আগে।

সতীশ

আচ্ছা বাঁশি, ঐ ক্ষিতীশের মধ্যে কী দেখতে পাও বলো তো।

বাঁশরী

বিধাতা ওকে যে পরীক্ষার কাগজটা দিয়েছিলেন, দেখতে পাই তার উত্তরটা। আর দেখি তারই মাঝখানে পরীক্ষকের একটা মস্ত কাটা দাগ।

সতীশ

এমন ফেল-করা জিনিস নিয়ে করবে কী।

বাঁশরী

ডান হাত ধরে ওকে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করে দেব।

সতীশ

তার পরে বাঁ হাত দিয়ে প্রাইজ দেবার প্ল্যান আছে না কি?

বাঁশরী

দিলে পরের ছেলের প্রতি নিষ্ঠুরতা করা হবে।

সতীশ

ঘরের ছেলের প্রতিও। এ দিকে ও মহলের হাল খবরটা শুনেছ?

বাঁশরী

ও মহলের খবর এ মহলে এসে পৌছয় না। হাওয়া বইছে উল্টো দিকে।

সতীশ

কথা ছিল সুষমার বিয়ে হবে মাসখানেক বাদে, সম্প্রতি স্থির হয়েছে আসছে হপ্তায়।

বাঁশরী

হঠাৎ দম এত দ্রুতবেগে চড়িয়ে দিলে যে?

সতীশ

ওদের হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠেছে দ্রুতবেগে, হঠাৎ দেখেছে তোমাকে রণরঙ্গিণী বেশে। তোমার তীর ছোটার আগেই ছুটে বেরিয়ে পড়তে চায়— এইরকম আন্দাজ।

বাঁশরী

আমার তীর! আধমরা প্রাণীকে আমি ছুঁই নে। বনমালী, মোটর ডাকো।

বাঁশরীর প্রস্থান। শৈলর প্রবেশ : বয়স বাইশ কিন্তু দেখে মনে হয় ষোলো থেকে আঠারোর মধ্যে ; তনু দেহ শ্যামবর্ণ, চোখের ভাব স্নিগ্ধ, মুখের ভাব মমতায় ভরা।

সতীশ

কী আশ্চর্য! ভোরের স্বপ্নে আজ তোমাকেই দেখেছি, শৈল। তুমিও আমাকে দেখেছ নিশ্চয়।

শৈল

না, দেখি নি তো।

সতীশ

আঃ, বানিয়ে বলো-না কেন। বড়ো নিষ্ঠুর তুমি। আমার দিনটা মধুর হয়ে উঠত তা হলে।

শৈল

তোমাদের ফরমাশে নিজেকে স্বপ্ন করে বানাতে হবে!

আমরা যা শুধু তাই নিয়ে তোমাদের মন খুশি হয় না কেন?

সতীশ

খুব হয়, এই যে সাক্ষাৎ এসেছ এর চেয়ে আর কিসের দরকার?

শৈল

আমি এসেছি বাঁশরীর কাছে।

সতীশ

ঐ দেখো, আবার একটা সত্য কথা। সত্ত বিছানা থেকে উঠেই তু-তুটো খাঁটি সত্য কথা সহ্য করি এত মনের জোর নেই। ধর্মরাজ মাপ করতেন তোমাকে, যদি বলতে আমারই জন্য এসেছ।

শৈল

ব্যারিস্টার মানুষ, তুমি বড্ড লিটরল্। বাঁশরীর কাছে আসতে চেয়েছি বলে তোমার কাছে আসবার কথা মনে ছিল না এটা ধরে নিলে কেন?

সতীশ

খোঁটা দেবার জন্যে। বাঁশির সঙ্গে কথা আছে কিছু? আমাদের লগ্ন স্থির করবার পরামর্শ?

শৈল

না, কোনো কথা নেই। ওর জন্য বড়ো মন খারাপ

হয়ে থাকে। মনের মধ্যে মরণবাণ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে অথচ কবুল করবার মেয়ে নয়। ওর ব্যথায় হাত বুলোতে গেলে ফোঁস্ করে ওঠে, সেটা যেন সাপের মাথার মণি। তাই সময় পেলে কাছে এসে বসি, যা-তা বকে যাই। পর্শু দিন সকালে এসেছিলুম ওর ঘরে। পায়ের শব্দ পায় নি। ওর সামনে এক বাণ্ডিল চিঠি। ডেস্কে ঝুঁকে পড়ছিল বসে, বেশ বুঝতে পারলুম চোখ দিয়ে জল পড়ছে। যদি জানত আমি দেখতে পেয়েছি তা হলে একটা কাণ্ড বাধত। বোধ হয় আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেত। আস্তে আস্তে চলে গেলুম। কিন্তু সেই ছবি আমি ভুলতে পারি নে। বাঁশি গেল কোথায়?

খানসামা চায়ের সরঞ্জাম রেখে গেল

সতীশ

বাঁশি এইমাত্র বেরিয়ে গেছে, ভাগ্যিস্ গেছে।

শৈল

ভারি স্বার্থপর তুমি।

সতীশ

অত্যন্ত। ও কী, উঠছ কেন? চা তৈরি শুরু করো।

শৈল

খেয়ে এসেছি।

সতীশ

তা হোক-না, আমি তো খাই নি। বসে খাওয়াও আমাকে। কবিরাজী মতে একলা চা খাওয়া নিষেধ, ওতে বায়ু প্রকুপিত হয়ে ওঠে।

শৈল

মিথ্যে আব্দার কর কেন ?

সতীশ

সুযোগ পেলেই করি, তোমার মতো খাঁটি সত্য আমার ধাতে নেই। ঢালো চা, ও কী করলে, চায়ে আমি চিনি দিই নে তুমি জান।

শৈল

ভুলে গিয়েছিলুম।

সতীশ

আমি হলে কখনো ভুলতুম না।

শৈল

আমাকে স্বপ্ন দেখে অবধি তোমার মেজাজের তো কোনো উন্নতি হয় নি। ঝগড়া করছ কেন ?

সতীশ

কারণ, মিষ্টি কথা পাড়লে তুমিই ঝগড়া বাধাতে। সীরিয়স্ হয়ে উঠতে।

শৈল

আচ্ছা থামো, তোমার চা খাওয়া হল ?

সতীশ

হলেই যদি ওঠ তা হলে হয় নি।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য

হরিশবাবু দলিলপত্র নিয়ে এসেছেন।

সতীশ

বলো ফুরসত নেই।

ভৃত্যের প্রস্থান

শৈল

ও কী ও, কাজ কামাই করবে !

সতীশ

করব, আমার খুশি।

শৈল

আমি যে দায়ী হব।

সতীশ

তাতে সন্দেহ নেই, বিনা কারণে কেউ কাজ কামাই করে না।

নেপথ্য থেকে

সতীশদা !

সতীশ

ঐ রে! এল ওরা! বাড়িতে নেই বলবার সময় দিলে না।

সুধাংশুর সঙ্গে একদল লোকের প্রবেশ

অলক্ষুণের দল, সকালবেলায় মুখ দেখলুম, উননের উপর হাঁড়ির তলা যাবে ফেটে।

সুধাংশু

মিস্ শৈল, ভীরু তোমার আশ্রয় নিয়েছে কিন্তু আজ ছাড়ছি নে!

সতীশ

ভয় দেখাও কেন? চাও কী?

শচীন

চাই লক্ষ্মীছাড়া ক্লাবের চাঁদা। প্রথম দিন থেকেই বাকি।

সতীশ

কী! আমি তোমাদের দলে! ভিগরস্ প্রোটেস্ট্ জানাচ্ছি, বলবান অস্বীকৃতি।

নরেন

দলিল দেখাও।

সতীশ

আমার দলিল, এই সামনে সশরীরে।

সুধাংশু

শৈলদেবী, এই বুঝি! বে-আইনী প্রশ্রয় দেন পলাতকাকে।

শৈল

কিছু প্রশ্রয় দিই নে, নিন-না আপনাদের দাবি আদায় করে।

সতীশ

শৈল, যত তোমার সত্য আমার বেলায়, আর এদের সামনে সত্যের অপলাপ। প্রশ্রয় দেও না বলতে চাও!

শৈল

কী প্রশ্রয় দিয়েছি?

সতীশ

এইমাত্র মাথার দিব্যি দিয়ে আমাকে চা খাওয়াতে বস নি? শ্রীহস্তে অজীর্ণরোগের পত্তন আরম্ভ, তবু আমাকে বলে লক্ষ্মীছাড়া!

শচীন

লোকটা লোভ দেখিয়ে কথা বলছে। শৈলদেবী, যদি শক্ত হয়ে থাকতে পার তা হলে ওকে আমাদের লাইফ-মেম্বর করে নিই।

সতীশ

আচ্ছা তবে বলি শোনো। চাঁদা পাবা মাত্র যদি পাড়া ছেড়ে দৌড় মার, তা হলে এখনি বাকি বকেয়া সব শোধ করে দিই।

শচীন

শুধু চাঁদা নয়। আমাদের ঘরে নেই চা ঢেলে দেবার লোক, যাদের ঘরে আছে সেখানে পালা করে চা খেতে বেরোই, তার পরে কিছু ভিক্ষে নিয়ে যাই— আজ এসেছি বাঁশরী দেবীর করকমল লক্ষ্য করে।

সতীশ

সৌভাগ্যক্রমে সেই দেবী তার করকমলসুদ্ধ অনুপস্থিত। অতএব ঘড়ি ধরে ঠিক পাঁচ মিনিটের নোটিশ দিচ্ছি, বেরোও তোমরা— ভাগো।

শৈল

আহা, ও কী কথা! না খেয়ে যাবেন কেন? আমি বুঝি পারি নে খাওয়াতে? একটু বসুন, সব ঠিক করে দিচ্ছি।

শৈলের প্রস্থান

সতীশ

কিন্তু ঐ যে ভিক্ষার কথাটা বললে, ভালো ঠেকল না। উদ্দেশ্যও বুঝতে পারছি নে।

সুধাংশু

কিংখাবের দোকানে আমাদের সমবেত দেনা আছে, আজ সমবেত চেষ্টায় শোধ করতে হবে।

সতীশ

কিংখাব! ভাবী লক্ষ্মীর আসন-রচনা?

শচীন

ঠিক তাই।

সতীশ

আশ্চর্য দূরদর্শিতা—

শচীন

না হে, অদূরদর্শিতা প্রমাণ করে দেব অবিলম্বে।

শৈলের প্রবেশ

শৈল

সব প্রস্তুত, আসুন আপনারা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বারান্দায় সোমশংকর। গহনার বাক্স খুলে জহুরি গহনা দেখাচ্ছে। কাপড়ের গাঁঠরি নিয়ে অপেক্ষা করছে কাশ্মীরী দোকানদার।

বাঁশরী

কিছু বলবার আছে।

সোমশংকর

(জহুরি ও কাশ্মীরীকে ইঙ্গিতে বিদায় করলে) ভেবেছিলুম আজই যাব তোমার কাছে।

বাঁশরী

ও-সব কথা থাক্। ভয় নেই, কান্নাকাটি করতে আসি নি। তবু আর কিছু না হোক তোমার ভাবনা ভাববার অধিকার একদিন দিয়েছ আমাকে। তাই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, জান সুষমা তোমাকে ভালোবাসে না ?

সোমশংকর

জানি।

বাঁশরী

তাতে তোমার কিছুই যায় আসে না ?

সোমশংকর

কিছুই না।

বাঁশরী

তা হলে সংসারযাত্রাটা কিরকম হবে ?

সোমশংকর

সংসারযাত্রার কথা ভাবছিই নে।

বাঁশরী

তবে কিসের কথা ভাবছ ?

সোমশংকর

একমাত্র সুষমার কথা।

বাঁশরী

অর্থাৎ ভাবছ, তোমাকে ভালো না বেসেও কী করে সুখী হবে ঐ মেয়ে।

সোমশংকর

না, তা নয়। সুখী হবার কথা সুষমা ভাবে না, ভালো-বাসারও দরকার নেই তার।

বাঁশরী

কিসের দরকার আছে তার, টাকার ?

সোমশংকর

তোমার যোগ্য কথা হল না, বাঁশি।

বাঁশরী

আচ্ছা, ভুল করেছি। কিন্তু প্রশ্নটার উত্তর বাকি। কিসের দরকার আছে সুষমার ?

সোমশংকর

ওর একটি ব্রত আছে। ওর জীবনে সমস্ত দরকার তাই নিয়ে, তাকে সাধ্যমতো সার্থক করা আমারও ব্রত।

বাঁশরী

ওর ব্রত আগে, তারই পশ্চাতে তোমার, পুরুষের মতো শোনাচ্ছে না, এ কথা ক্ষত্রিয়ের মতো নয়ই। এত-বড়ো পুরুষকে মন্ত্র পড়িয়েছে ঐ সন্ন্যাসী। বুদ্ধিকে দিয়েছে ঘোলা করে, দৃষ্টিকে দিয়েছে চাপা। শুনলুম সব, ভালো হল। গেল আমার শ্রদ্ধা ভেঙে, গেল আমার বন্ধন ছিঁড়ে। বয়স্ক শিশুকে মানুষ করবার কাজ আমার নয়, সে কাজের ভার সম্পূর্ণ দিলেম ছেড়ে ঐ মেয়ের হাতে।

পুরন্দরের প্রবেশ। সোমশংকর প্রণাম করলে, অগ্নিশিখার মতো বাঁশরী উঠে দাঁড়াল তার সামনে।

বাঁশরী

আজ রাগ করবেন না, ধৈর্য ধরবেন; কিছু প্রশ্ন করব।

পুরন্দরের ইঙ্গিতে সোমশংকরের প্রস্থান

পুরন্দর

আচ্ছা, বলো তুমি।

বাঁশরী

জিজ্ঞাসা করি, সোমশংকরকে শ্রদ্ধা করেন আপনি? ওকে খেলার পুতুল বলে মনে করেন না?

পুরন্দর

বিশেষ শ্রদ্ধা করি।

বাঁশরী

তবে কেন এমন মেয়ের ভার দিচ্ছেন ওর হাতে যে ওকে ভালোবাসে না?

পুরন্দর

জান না এ অতি মহৎ ভার, একই কালে ক্ষত্রিয়ের পুরস্কার এবং পরীক্ষা। সোমশংকরই এই ভার গ্রহণ করবার যোগ্য।

বাঁশরী

যোগ্য বলেই ওর চিরজীবনের সুখ নষ্ট করতে চান আপনি?

পুরন্দর

সুখকে উপেক্ষা করতে পারে ঐ বীর মনের আনন্দে।

বাঁশরী

আপনি মানবপ্রকৃতিকে মানেন না?

পুরন্দর

মানবপ্রকৃতিকেই মানি, তার চেয়ে নিচের প্রকৃতিকে নয়।

বাঁশরী

এতই যদি হল, ওরা বিয়ে নাই করত ?

পুরন্দর

ব্রতকে নিষ্কামভাবে পোষণ করবে মেয়ে, ব্রতকে নিষ্কামভাবে প্রয়োগ করবে পুরুষ— এই কথা মনে করে দুটি মেয়ে পুরুষ অনেকদিন খুঁজেছি। দৈবাৎ পেয়েছি।

বাঁশরী

পুরুষ বলেই বুঝতে পারছ না যে, ভালোবাসা নইলে দুজন মানুষকে মেলানো যায় না।

পুরন্দর

মেয়ে বলেই বুঝতে ইচ্ছা করছ না— ভালোবাসার মিলনে মোহ আছে, প্রেমের মিলনে মোহ নেই।

বাঁশরী

মোহ চাই, চাই, সন্ন্যাসী, মোহ নইলে সৃষ্টি কিসের ! তোমার মোহ তোমার ব্রত নিয়ে— সেই ব্রতের টানে তুমি মানুষের মনগুলো নিয়ে কেটে ছিঁড়ে জোড়াতাড়া দিতে বসেছ ; বুঝতেই পারছ না তারা সজীব পদার্থ,

তোমার প্ল্যানের মধ্যে খাপ খাওয়াবার জন্য তৈরি হয় নি। আমাদের মোহ সুন্দর, আর ভয়ংকর তোমাদের মোহ!

পুরন্দর

মোহ নইলে সৃষ্টি হয় না, মোহ ভাঙলে প্রলয়, এ কথা মানতে রাজি আছি। কিন্তু তুমিও এ কথা মনে রেখো, আমার সৃষ্টি তোমার সৃষ্টির চেয়ে অনেক উপরে। তাই আমি নির্মম হয়ে তোমার সুখ দেব ছারখার করে। আমিও চাইব না সুখ; যারা আসবে আমার কাছে সুখের দিক থেকে, মুখ দেব ফিরিয়ে। আমার ব্রতই আমার সৃষ্টি, তার যা প্রাপ্য তা তাকে দিতেই হবে। যতই কঠিন হোক।

বাঁশরী

সেইজন্যেই সজীব নয় তোমার আইডিয়া, সন্ন্যাসী। তুমি জান মন্ত্র, জান না মানুষকে। মানুষের মর্মগ্রন্থি টেনে ছিঁড়ে সেইখানে তোমার কেঠো আইডিয়ার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে অসহ্য ব্যথার 'পরে মস্ত মস্ত বিশেষণ চাপা দিতে চাও। তাকে বল শান্তি? টিঁকবে না ব্যাণ্ডেজ, ব্যথা যাবে থেকে। তোমরা সব অমানুষ, মানুষের বসতিতে এলে কী করতে! যাও-না তোমাদের গুহাগহ্বরে বদরিকাশ্রমে। সেখানে মনের সাধে নিজেদের শুকিয়ে পাথর করে ফেলো। আমরা সামান্য মানুষ, আমাদের

তৃষ্ণার জল মুখের থেকে কেড়ে নিয়ে মরুভূমিতে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে সাধনা বলে প্রচার করতে চাও কোন্ করুণায়! ব্যর্থ জীবনের অভিশাপ লাগবে না তোমাকে? যা নিজে ভোগ করতে জান না তা ভোগ করতে দেবে না ক্ষুধিতকে?

সুষমার প্রবেশ

এই যে সুষমা! শোন্, বলি। মরীয়া হয়ে মেয়েরা চিতার আগুনে মরেছে অনেক, ভেবেছে তাতেই পরমার্থ। তেমনি করেই নিজের হাতে নিজের ভাগ্যে আগুন লাগিয়ে দিনে দিনে মরতে চাস, জ্ব'লে জ্ব'লে। চাস নে তুই ভালোবাসা, কিন্তু যে মেয়ে চায়, পাষাণ সে করে নি আপন নারীর প্রাণ, কেন কেড়ে নিতে এলি তার চিরজীবনের আনন্দ? এই আমি আজ বলে দিলুম তোকে, ঘোড়ায় চড়িস, শিকার করিস, সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র নিস, তবু তুই পুরুষ নোস— আইডিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তোর দিন কাটবে না গো, তোর রাত বিছিয়ে দেবে কাঁটার শয়ন।

সোমশংকরের প্রবেশ

সোমশংকর

বাঁশি, শান্ত হও, চলো এখান থেকে।

বাঁশরী

যাব না তো কী! মনে কোরো না মরব বুক ফেটে, জীবন হবে চিরচিতানলের শ্মশান। কখনো এমন বিচলিত দশা হয় নি আমার! আজ কেন এল বন্যার মতো এই পাগ্‌লামি। লজ্জা! লজ্জা! লজ্জা! তোমাদের তিনজনের সামনে এই অপমান। থামো সোমশংকর, আমাকে দয়া করতে এস না। মুছে ফেলব এই অপমান, কোনো চিহ্ন থাকবে না এর কাল। এই আমি বলে গেলুম।

বাঁশরী ও সুষমার প্রস্থান

পুরন্দর

সোমশংকর, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

সোমশংকর

বলুন।

পুরন্দর

যে ব্রত তুমি স্বীকার করেছ তা সম্পূর্ণ ই তোমার আপন হয়েছে কি? তার ক্রিয়া চলেছে তোমার প্রাণ-ক্রিয়ার সঙ্গে?

সোমশংকর

কেন সন্দেহ বোধ করছেন!

পুরন্দর

আমার প্রতি ভক্তিতেই যদি এই সংকল্প গ্রহণ করে থাক তবে এখনি ফেলে দাও এই বোঝা।

সোমশংকর

এমন কথা কেন বলছেন আজ? আমার মধ্যে দুর্বলতার লক্ষণ কিছু দেখছেন কি?

পুরন্দর

মোহিনীশক্তি আছে আমার এমন কথা কেউ কেউ বলে। শুনে লজ্জা পাই। জাদুকর নই আমি।

সোমশংকর

আত্মার ক্রিয়াকে যারা বিশ্বাস করে না তারা তাকে বলে জাদুর ক্রিয়া।

পুরন্দর

ব্রতের মাহাত্ম্য তার স্বাধীনতায়। যদি ভুলিয়ে থাকি তোমাকে, সে ভুল ভাঙতে হবে। গুরুবাক্য বিষ, সে বাক্য যদি তোমার নিজের বাক্য না হয়।

সোমশংকর

সন্ন্যাসী, যে ব্রত নিয়েছি সে আজ আমার রক্তে বইছে তেজরূপে, জ্বলছে বুকের মধ্যে হোমাগ্নির মতো। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, আজ আমার দ্বিধা কোথায়?

পুরন্দর

এই কথাই শুনতে চেয়েছিলুম তোমার মুখ থেকে। আর একটি কথা বাকি আছে। কেউ কেউ প্রশ্ন করে, কেন সুষমার বিবাহ দিলুম তোমার সঙ্গে। তোমারই কাছ থেকে আমি তার উত্তর চাই।

সোমশংকর

এতদিনের তপস্যায় এই নারীর চিত্তকে তুমি যজ্ঞের অগ্নিশিখার মতো ঊর্ধ্বে জ্বালিয়ে তুলেছ, আমারই 'পরে ভার দিলে এই অনির্বাণ অগ্নিকে চিরদিন রক্ষা করতে।

পুরন্দর

বৎস, যতদিন রক্ষা করবে তার দ্বারা তুমি আপনাকেই রক্ষা করতে পারবে। ঐ তোমার মূর্তিমান ধর্ম রইল তোমার সঙ্গে— ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতম্‌। আমার বন্ধন থেকে তুমি মুক্ত, সেই সঙ্গে শিষ্যের বন্ধন থেকে আমিও মুক্তি পেলুম। তোমাদের বিবাহের পর আমাকে যেতে হবে দূরে, হয়তো কোনোদিন আমার আর দেখা পাবে না। আমার এই আশীর্বাদ রইল, জানথ আত্মানম্‌— আপনাকে পূর্ণ করে জানো।

পুরন্দরের প্রস্থান। সোমশংকর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল

সোমশংকর

ওরে ভোলা, সেই নতুন গানটা—

গান

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।
একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো।
দুন্দুভিতে হল রে কার আঘাত শুরু,
বুকের মধ্যে উঠল বেজে গুরুগুরু,
পালায় ছুটে সুপ্তিরাতের স্বপ্নে-দেখা মন্দ ভালো।
নিরুদ্দেশের পথিক, আমায় ডাক দিলে কি।
দেখতে তোমায় না যদি পাই নাই বা দেখি।
ভিতর থেকে ঘুচিয়ে দিলে চাওয়া পাওয়া,
ভাবনাতে মোর লাগিয়ে দিলে ঝড়ের হাওয়া,
বজ্রশিখায় এক পলকে মিলিয়ে দিলে সাদা কালো।

নেপথ্য থেকে

যেতে পারি কি ?

সোমশংকর

এসো এসো।

তারকের প্রবেশ

তারক

রাজাবাহাদুর, আজকাল তোমার কাছে আসতে কি-রকম ভয়-ভয় করে।

সোমশংকর

কোনো কারণ তো দেখি নে।

তারক

কারণ নেই বলেই তো ভয় বেশি। আজ বাদে কাল বিয়ে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন দ্বীপান্তরে চলেছ। ভয়ানক গাম্ভীর্য।

সোমশংকর

বিয়েটা তো এক লোক থেকে অন্য লোকে যাত্রাই বটে।

তারক

সব বিয়ে তা নয়, রাজন্। নিজের কথা বলতে পারি। আমার বরযাত্রা হয়েছিল পটলডাঙা থেকে চোরবাগানে। মনের ভিতরটাও তার বেশি এগোয় নি। আমার স্ত্রীর নাম পুষ্প। রসিকবন্ধু তার কবিতায় আমাকে খেতাব দিলে পুষ্পচোর। কবিতাটার হেডিং ছিল চৌরপঞ্চাশিকা। কবিকে প্রশ্ন করলেম, চৌরপঞ্চাশিকার একটা কবিতাই তো দেখছি, বাকি উনপঞ্চাশটা গেল কোথায়? উত্তর পেলেম, তারা উনপঞ্চাশ পবনরূপে বরের হৃদয়গহ্বরে বেড়াচ্ছে ঘুরপাক দিয়ে।

সোমশংকর

এর থেকে প্রমাণ হয় আমার রসিক বন্ধু নেই, তাই গাম্ভীর্য রয়েছে ঘনিয়ে।

তারক

আমাদের পাড়ার লক্ষ্মীছাড়ার দল অশোক গুপ্তদের বাগানে দর্‌মা-ঘেরা একটা পোড়ো ফর্‌নরিতে ক্লাব্‌ করেছে। আপিস থেকে ফিরে এসে সেইখানে সন্ধেবেলায় বিষম হল্লা করতে থাকে। সান্ত্বনা দেবার জন্যে আমরা লক্ষ্মীমন্তরা ওদের নিমন্ত্রণ করছি। তোমাকে প্রিজ়াইড করতে হবে।

সোমশংকর

শুনেছি বৈকুণ্ঠলুণ্ঠন পাঁচালি লিখে ওরা আমাকে লক্ষ্মীহারী দৈত্য বানিয়েছে।

তারক

সে কথা সত্যি। ওদের টেম্পেরেচর কমানো দরকার হয়েছে।

সোমশংকর

বৈধ উপায়ে ওদের ঠাণ্ডা করতে রাজি আছি।

তারক

আমাদের কমলবিলাস সেনগুপ্তকে দিয়ে একটা নিমন্ত্রণপত্র রচিয়ে নিয়ে এলুম।

সোমশংকর

পড়ে শোনাও।

লক্ষ্মী তোমার বাহনগুলি ধনে পুত্রে উঠুন ফুলি,
লুঠুন তোমার চরণধূলি গো—
আমরা স্কন্ধে লয়ে কাঁথা ঝুলি ফিরব ধরাতল।
তোমার বন্দরেতে বাঁধাঘাটে বোঝাই-করা সোনার পাটে
অনেক রত্ন অনেক হাটে গো,
আমরা নোঙর-ছেঁড়া ভাঙা তরী ভেসেছি কেবল।
আমরা এবার খুঁজে দেখি অকূলেতে কূল মেলে কি,
দ্বীপ আছে কি ভবসাগরে—
যদি সুখ না জোটে দেখব ডুবে কোথায় রসাতল।
আমরা জুটে সারাবেলা করব হতভাগার মেলা,
গাব গান, করব খেলা গো,
কণ্ঠে যদি সুর না আসে করব কোলাহল।

সোমশংকর

এবার কিঞ্চিৎ ফলাহারের আয়োজন করি।

সুধাংশু

আগে দেবী আসুন ঘরে, তার পরে ফলকামনা করব।

সোমশংকর

তৎপূর্বে—

সুধাংশু

তৎপূর্বে সুমহতী প্রতিহিংসা। (গাঁঠরি থেকে কিংখাবের আসন বেরোল) লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর ভক্তদের যোগ থাকবে এই আসনটিতে। তোমাদের ঘরের মাটি রইল তোমাদের, তার উপরে আসনটা রইল আমাদেরই। আর তাঁর কমলাসন, সে আছে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে।

সোমশংকর

কী তোমাদের বলব। বলবার কথা আমি জানি নে।

তারক

প্রজাপতি যাঁদের সাথে পাতিয়ে আছেন সখ্য,
আর যাঁরা সব প্রজাপতির ভবিষ্যতের লক্ষ্য,
উদরসেবার উদার ক্ষেত্রে মিলুন উভয় পক্ষ,
রসনাতে রসিয়ে উঠুক নানারসের ভক্ষ্য।
সত্যযুগে দেবদেবীদের ডেকেছিলেন দক্ষ,
অনাহূত পড়ল এসে মেলাই যক্ষ রক্ষ—
আমরা সে ভুল করব না তো, মোদের অন্নকক্ষ
দুই পক্ষেই অপক্ষপাত দেবে ক্ষুধার মোক্ষ।
আজো যাঁরা বাঁধনছাড়া ফুলিয়ে বেড়ান বক্ষ
বিদায়কালে দেব তাঁদের আশিস লক্ষ লক্ষ,
তাঁদের ভাগ্যে অবিলম্বে জুটুন কারাধ্যক্ষ—
এর পরে আর মিল মেলে না য র ল ব হ ক্ষ।

ঐ আসছে ওদের দল।

সুধাংশু শচীন প্রভৃতির প্রবেশ

সোমশংকর

কী উদ্দেশ্যে আগমন?

সুধাংশু

গান শোনাব।

সোমশংকর

তার পরে?

সুধাংশু

তার পরে নোব্‌ল্ রিভেঞ্জ্, সুমহতী প্রতিহিংসা।

সোমশংকর

ঐ মানুষটার কাঁধে ওটা কী? বোমা নয়?

সুধাংশু

ক্রমশঃ প্রকাশ্য। এখন গান।

সোমশংকর

কার রচনা?

শচীন

কপিরাইটের তর্ক আছে। বিষয় অনুসারে কপিরাইট্‌-স্বত্ব আমাদেরই, বাক্যগুলি যার তাকে আমরা গণ্য করি নে।

গান

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল
ভবের পদ্মপত্রে জল
সদাই করছি টলোমল,
মোদের আসাযাওয়া শূন্য হাওয়া,
নাইকো ফলাফল।
নাহি জানি করণ কারণ, নাহি জানি ধরণ ধারণ,
নাহি মানি শাসন বারণ গো—
আমরা আপন রোখে মনের ঝোঁকে ছিঁড়েছি শিকল।

তৃতীয় অঙ্ক

শেষ দৃশ্য

বাঁশরীদের বাড়ি। সতীশ ডেস্কে বসে লিখছে
সুষমার ছোটো বোন সুষীমার প্রবেশ

সতীশ

আমার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করতে এসেছিস? বরের মুখ-দেখা বুঝি আজ?

সুষীমা

যাও!

সতীশ

যাও কী! বেশি দিনের কথা নয়, তোর বয়স যখন পাঁচ, মাকে জিজ্ঞাসা করিস আমাকে বিয়ে করতে তোর কী জেদ ছিল। আমি তোকে সোনার বালা গড়িয়ে দিয়েছিলুম, সেটা ভেঙে ব্রোচ্‌ তৈরি হয়েছে।

সুষীমা

সতীশদা, কী বকছ তুমি?

সতীশ

আচ্ছা থাক্‌ তবে, কী জন্যে এসেছিস?

সুষীমা

দিদির বিয়েতে প্রেজেণ্ট্‌ দেব।

সতীশ

সে তো ভালো কথা। কী দিতে চাস ?

সুষীমা

এই চামড়ার থলিটা।

সতীশ

ভালো জিনিস, আমারই লোভ হচ্ছে।

সুষীমা

আমি এসেছি বাঁশিদিদির কাছে।

সতীশ

ওখান থেকে কেউ তোকে পাঠিয়ে দিয়েছে ?

সুষীমা

না, লুকিয়ে এসেছি, কেউ জানে না। আমার এই থলির উপরে বাঁশিদিদিকে দিয়ে আঁকিয়ে নেব।

সতীশ

বাঁশিদিদি আঁকতে পারে কে বললে তোকে ?

সুষীমা

শংকরদাদা। তার কাছে একটা সিগারেট্ কেস্ আছে, সেটা বাঁশিদিদির দেওয়া। তার উপরে একজোড়া পায়রা এঁকেছেন নিজের হাতে। চমৎকার !

সতীশ

আচ্ছা, তোর বাঁশিদিদিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

প্রস্থান। বাঁশরীর প্রবেশ

বাঁশরী

কী, সুষী!

সুষীমা

তোমাকে সতীশদাদা সব বলেছেন?

বাঁশরী

হাঁ বলেছেন। ছবি এঁকে দেব তোর থলির উপর? কী ছবি আঁকব?

সুষীমা

একজোড়া পায়রা, ঠিক যেমন এঁকেছ শংকরদাদার সিগারেট্‌ কেসের উপরে।

বাঁশরী

ঠিক তেমনি করেই দেব। কিন্তু কাউকে বলিস নে যে আমি এঁকে দিয়েছি।

সুষীমা

কাউকে না।

বাঁশরী

তোকেও একটা কাজ করতে হবে, নইলে আমি আঁকব না।

সুষীমা

বলো কী করতে হবে।

বাঁশরী

সেই সিগারেট্ কেস্‌টা আমাকে এনে দিতে হবে।

সুষীমা

তাঁর বুকের পকেটে থাকে। কক্ষনো আমাকে দেবেন না।

বাঁশরী

আমার নাম করে বলিস দিতেই হবে।

সুষীমা

তুমি তাঁকে দিয়েছ, আবার ফিরিয়ে নেবে কী করে?

বাঁশরী

তোমার শংকরদাদাও দেওয়া জিনিস ফিরিয়ে নেন।

সুষীমা

কক্ষনো না।

বাঁশরী

আচ্ছা, তাঁকে জিজ্ঞাসা করিস আমার নাম করে।

সুষীমা

আচ্ছা, করব। আমি যাই, কিন্তু ভুলো না আমার কথা।

বাঁশরী

তুইও ভুলিস না আমার কথা, আর নিয়ে যা একবাক্স চকোলেট্, কাউকে বলিস নে আমি দিয়েছি।

সুষীমা

কেন ?

বাঁশরী

মা জানতে পারলে রাগ করবেন।

সুষীমা

কেন ?

বাঁশরী

যদি তোর অসুখ করে।

সুষীমা

বলব না, কিন্তু খেতে দেব শংকরদাদাকেও।

সুষীমার প্রস্থান

একখানা খাতা হাতে নিয়ে বাঁশরী সোফায় হেলান দিয়ে বসল

লীলার প্রবেশ

বাঁশরী

দেখ্ লীলা, মুখ গম্ভীর করে আসিস নে, ভাই। তা হলে ঝগড়া হয়ে যাবে। মনে হচ্ছে, সান্ত্বনা দেবার কুমৎলব আছে, বাদল নামল বলে। দুঃখ আমার সয়, সান্ত্বনা আমার সয় না, সে তোদের জানা। বসেছিলেম গ্রামোফোনে কমিক গান বাজাতে, কিন্তু তার চেয়ে কমিক জিনিস নিয়ে পড়েছি।

লীলা

কী বলো তো, বাঁশি।

বাঁশরী

ক্ষিতীশের এই গল্পখানা।

লীলা

(খাতাটা তুলে নিয়ে) 'ভালোবাসার নীলাম'— নামটা চলবে বাজারে।

বাঁশরী

বস্তুটাও। এ জিনিসের কাট্‌তি আছে। পড়তে চাস ?

লীলা

না ভাই, সময় নেই, বিয়েবাড়ি সাজাবার জন্যে ডাক পড়েছে।

বাঁশরী

আমি কি সাজাতে পারতুম না !

লীলা

আমার চেয়ে অনেক ভালো পারতিস।

বাঁশরী

ডাকতে সাহস হল না ! ভীরু ওরা।

লীলা

তা নয়, লজ্জা হল। কী বলে তোকে ডাকবে ?

বাঁশরী

না ডেকেই লজ্জা দিলে আমাকে। ভাবছে আমি অন্নজল ছেড়ে ঘরে দরজা দিয়ে কেঁদে মরছি। ওদের সঙ্গে যখন তোর দেখা হবে কথাপ্রসঙ্গে বলিস, 'বাঁশী বিছানায় শুয়ে কমিক গল্প পড়ছিল, পেট ফেটে যাচ্ছিল হেসে হেসে।' নিশ্চয় বলিস।

লীলা

নিশ্চয় বলব, গল্পের বিষয়টা কী বল্ দেখি ?

বাঁশরী

হিরোর নাম স্যার চন্দ্রশেখর। নায়িকা পঙ্কজা, ধনকুবেরের মন ভোলাতে লেগেছেন উঠে পড়ে। ওঠার চেয়ে পড়ার অংশটাই বেশি। সেণ্ট্-এণ্টনির টেম্‌টেশন্— ছবি দেখেছিস তো ? দিনের পর দিন নূতন বেহায়াগিরি— তোর খুব যে শুচিবাই তা নয়, তবু ক্ষণে ক্ষণে গঙ্গার ঘাটে দৌড় মারতে চাইতিস। দ্বিতীয় নম্বরের নায়িকা গলা ভেঙে মরছে পঙ্ককুণ্ডের ধারে দাঁড়িয়ে। অবশেষে একদিন পৌষমাসের অর্ধরাতে খিড়কির ঘাটে— তুই ভাবছিস হতভাগিনী আত্মহত্যা করে বাঁচল— ক্ষিতীশের কল্পনাকে অবিচার করিস নে— নায়িকা জলের মধ্যে এক পৈঁঠে পর্যন্ত নেবেছিল। ঠাণ্ডা জলে ছ্যাঁক্ করে উঠল গা'টা। ছুটল গরম বিছানা লক্ষ্য করে। এইখানটাতে সাইকলজির

তর্ক এই, শীত করল বলে মরা মুলইতুবি কিম্বা শীত করাতে আগুনের কথাটা মাথায় এল, অমনি ভাবল ওদের জ্বালিয়ে মারবে বেঁচে থেকে।

লীলা

কিছুতে বুঝতে পারি নে, এত লোক থাকতে ক্ষিতীশের উপর এত ভরসা রেখেছিস কী করে।

বাঁশরী

অবিচার করিস নে। ওর লেখবার শক্তি আছে। ও আমাদের ময়মনসিংহের বাগানের আম, জাত ভালো, কিন্তু যতই চেষ্টা করা গেল ভিতরে পোকা হতেই আছে। ঐ পোকা বাদ দিয়ে কাজে লাগানো হয়তো চলবে। ঐ বুঝি আসছে।

লীলা

আমি তবে চললুম।

বাঁশরী

একেবারে যাস নে। সন্ধেবেলাটা কোনও মতে কাটাতে হবে। কমিক গল্পটা তো শেষ হল।

লীলা

কমিক গল্পের একটিনি করতে হবে বুঝি আমাকেই? আচ্ছা, রইলুম পাশের ঘরে।

ক্ষিতীশের প্রবেশ

ক্ষিতীশ

কেমন লাগল ? মেলোড্রামার খাদ মেশাই নি সিকি তোলাও। সেন্টিমেন্টালিটির তরল রস চায় যে-সব খুকীরা তাদের পক্ষে নির্জলা একাদশী। একেবারে নিষ্ঠুর সত্য।

বাঁশরী

কেমন লাগল বুঝিয়ে দিচ্ছি (পাতাগুলি ছিঁড়ে ফেলল)।

ক্ষিতীশ

করলে কী! সর্বনাশ! এটা আমার সব লেখার সেরা, নষ্ট করে ফেললে ?

বাঁশরী

দলিলটা নষ্ট করে ফেললেই সেরা জিনিসের বালাই থাকে না। কৃতজ্ঞ হোয়ো আমার 'পরে।

ক্ষিতীশ

সাহিত্যে নিজে কিছু দেবার শক্তি নেই, অথচ সংকোচ নেই তাকে বঞ্চিত করতে। এর দাম দিতে হবে, কিছুতে ছাড়ব না।

বাঁশরী

কী দাম চাই ?

ক্ষিতীশ

তোমাকে !

বাঁশরী

ক্ষতিপূরণ এত সস্তায়, সাহস আছে নিতে ?

ক্ষিতীশ

আছে।

বাঁশরী

সেন্টিমেন্ট্ এক ফোঁটাও মিলবে না।

ক্ষিতীশ

আশাও করি নে।

বাঁশরী

নির্জলা একাদশী, নিষ্ঠুর সত্য !

ক্ষিতীশ

রাজি আছি।

বাঁশরী

আছ রাজি ? বুঝেসুঝে বলছ ? এ কমিক নভেল নয়, ভুল করলে প্রুফ দেখা চলবে না, এডিশন্ও ফুরোবে না মরার দিন পর্যন্ত।

ক্ষিতীশ

শিশু নই, এ কথা বুঝি।

বাঁশরী

না মশায়, কিচ্ছু বোঝ না। বুঝতে হবে দিনে দিনে পলে পলে, বুঝতে হবে হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায়।

ক্ষিতীশ

সেই হবে আমার জীবনের সব চেয়ে বড়ো অভিজ্ঞতা।

বাঁশরী

তবে বলি শোনো। অবোধের ’পরে মেয়েদের স্বাভাবিক স্নেহ। তোমার উপর কৃপা আছে আমার। তাই অবুঝের মতো নিজের সর্বনাশের যে প্রস্তাবটা করলে তাতে সম্মতি দিতে দয়া হচ্ছে।

ক্ষিতীশ

সম্মতি না দিলে সাংঘাতিক নির্দয়তা হবে। সামলে উঠতে পারব না।

বাঁশরী

মেলোড্রামা ?

ক্ষিতীশ

না, মেলোড্রামা নয়।

বাঁশরী

ক্রমে মেলোড্রামা হয়ে উঠবে না ?

ক্ষিতীশ

যদি হয় তবে সেই দিনগুলোকে ঐ খাতার পাতার মতো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলো।

বাঁশরী

(উঠে দাঁড়িয়ে) আচ্ছা, সম্মতি দিলেম। (ক্ষিতীশ ছুটে এল বাঁশরীর দিকে) ঐ রে শুরু হল। ভালো করে ভেবে দেখো, এখনও পিছোবার সময় আছে।

ক্ষিতীশ

(করজোড়ে) মাপ করো, ভয় হচ্ছে পাছে মত বদলায়।

বাঁশরী

যখন বদলাবে তখন ভয় কোরো। অমন মুখের দিকে তাকিয়ে থেকো না। দেখতে খারাপ লাগে। যাও রেজেস্ট্রি আফিসে। তিন-চার দিনের মধ্যে বিয়ে হওয়া চাই।

ক্ষিতীশ

নোটিশের মেয়াদ কমাতে আইনে যদি বাধে।

বাঁশরী

তা হলে বিয়েতেও বাধবে। দেরি করতে সাহস নেই।

ক্ষিতীশ

অনুষ্ঠান?

বাঁশরী

হবে না অনুষ্ঠান, তোমার দেখছি কমিকের দিকে ঝোঁক আছে। এখনও বুঝলে না জিনিসটা সীরিয়াস্।

ক্ষিতীশ

কাউকে নিমন্ত্রণ ?

বাঁশরী

কাউকে না।

ক্ষিতীশ

কাউকেই না ?

বাঁশরী

আচ্ছা, সোমশংকরকে।

ক্ষিতীশ

কিরকম চিঠিটা লিখতে হবে তার একটা খসড়া—

বাঁশরী

খসড়া কেন, লিখে দিচ্ছি।

ক্ষিতীশ

স্বহস্তে ?

বাঁশরী

হাঁ, স্বহস্তেই।

ক্ষিতীশ

আজই ?

বাঁশরী

হাঁ, এখনই। (চিঠি লিখে) এই নাও পড়ো।

ক্ষিতীশের পাঠ

এতদ্‌দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে, শ্রীমতী বাঁশরী সরকারের সহিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভৌমিকের অবিলম্বে বিবাহ স্থির হইয়াছে। তারিখ জানানো অনাবশ্যক— আপনার অভিনন্দন প্রার্থনীয়। পত্রদ্বারা বিজ্ঞাপন হইল, ত্রুটি মার্জনা করিবেন। ইতি—

বাঁশরী

এ চিঠি এখনি রাজার দারোয়ানের হাতে দিয়ে আসবে। দেরি কোরো না।

ক্ষিতীশের প্রস্থান

লীলা, শুনে যা খবরটা।

লীলার প্রবেশ

লীলা

কী খবর ?

বাঁশরী

বাঁশরী সরকারের সঙ্গে ক্ষিতীশ ভৌমিকের বিবাহ পাকা হয়ে গেল।

লীলা

আঃ, কী বলিস্ তার ঠিকানা নেই।

বাঁশরী

এতদিন পরে একটা ঠিকানা হল।

লীলা

এটা যে আত্মহত্যা।

বাঁশরী

তার পরে পুনর্জন্মের প্রথম অধ্যায়।

লীলা

সব চেয়ে দুঃখ এই যে, যেটা ট্র্যাজেডি সেটাকে দেখাবে প্রহসন।

বাঁশরী

ট্র্যাজেডির লজ্জা ঘুচবে ঠাট্টার হাসিতে। অশ্রুপাতের চেয়ে অগৌরব নেই।

লীলা

আমাদের রাশিচক্র থেকে খসে পড়ল সব চেয়ে উজ্জ্বল তারাটি। যদি তার জ্বালা নিভত শোক করতুম না। জ্বালা সে সঙ্গে করে নিয়েই চলল অন্ধকারের তলায়।

বাঁশরী

তা হোক, ডার্‌ক্ হীট্, কালো আগুন, কারো চোখে পড়বে না। আমার জন্য শোক করিস নে, যে আমার

সাথি হতে চলল শোচনীয় সেই। এ কী! শংকর আসছে। তুই যা ভাই, একটু আড়ালে।

লীলার প্রস্থান। সোমশংকরের প্রবেশ

সোমশংকর

বাঁশি!

বাঁশরী

তুমি যে!

সোমশংকর

নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। জানি অন্য পক্ষ থেকে ডাকে নি তোমাকে। আমার পক্ষ থেকে কোনো সংকোচ নেই।

বাঁশরী

কেন সংকোচ নেই? ঔদাসীন্য?

সোমশংকর

তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি আর আমি যা দিয়েছি তোমাকে, এ বিবাহে তাকে স্পর্শমাত্র করতে পারবে না, এ তুমি নিশ্চয় জান।

বাঁশরী

তবে বিবাহ করতে যাচ্ছ কেন?

সোমশংকর

সে কথা বুঝতে যদি নাও পার, তবু দয়া কোরো আমাকে।

বাঁশরী

তবু বলো। বুঝতে চেষ্টা করি।

সোমশংকর

কঠিন ব্রত নিয়েছি, একদিন প্রকাশ হবে, আজ থাক্— দুঃসাধ্য আমার সংকল্প, ক্ষত্রিয়ের যোগ্য। কোনো-এক সংকটের দিনে বুঝবে সে ব্রত ভালোবাসার চেয়েও বড়ো। তাকে সম্পন্ন করতেই হবে প্রাণ দিয়েও।

বাঁশরী

আমাকে সঙ্গে নিয়ে সম্পন্ন করতে পারতে না?

সোমশংকর

নিজেকে কখনো তুমি ভুল বোঝাও না, বাঁশি। তুমি নিশ্চিত জান তোমার কাছে আমি দুর্বল। হয়তো একদিন তোমার ভালোবাসা আমাকে টলিয়ে দিত আমার ব্রত থেকে। যে দুর্গম পথে সুষমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আমাকে যাত্রায় প্রবৃত্ত করেছেন সেখানে ভালোবাসার গতিবিধি বন্ধ।

বাঁশরী

সন্ন্যাসী হয়তো ঠিকই বুঝেছেন। তোমার চেয়েও

তোমার ব্রতকে আমি বড়ো করে দেখতে পারতুম না। হয়তো সেইখানেই বাধত সংঘাত। আজ পর্যন্ত তোমার ব্রতের সঙ্গেই আমার শত্রুতা। তবে এই শত্রুর দুর্গে কোন্ সাহসে তুমি এলে ? একদিন যে শক্তি আমার মধ্যে দেখেছিলে আজ কিছু কি তার অবশিষ্ট নেই ? ভয় করবে না ?

সোমশংকর

শক্তি একটুও কমে নি, তবু ভয় করব না।

বাঁশরী

যদি তেমন করে পিছু ডাকি এড়িয়ে যেতে পারবে ?

সোমশংকর

কী জানি, না পারতেও পারি।

বাঁশরী

তবে ?

সোমশংকর

তোমাকে বিশ্বাস করি। আমার সত্য কখনোই ভাঙা পড়বে না তোমার হাতে। সংকটের মুখে যাবার পথে আমাকে হেয় করতে পারবে না তুমি। নিশ্চিত জান, সত্য ভঙ্গ হলে আমি প্রাণ রাখব না। মরব তুষানলে পুড়ে।

বাঁশরী

শংকর, তুমি ক্ষত্রিয়ের মতোই ভালোবাসতে পার। শুধু ভাব দিয়ে নয়, বীর্য দিয়ে। সত্যি করে বলো, আজও কি আমাকে সেদিনের মতোই ততখানিই ভালোবাস।

সোমশংকর

ততখানিই।

বাঁশরী

আর কিছুই চাই নে আমি। সুষমাকে নিয়ে পূর্ণ হোক তোমার ব্রত, তাকে ঈর্ষা করব না।

সোমশংকর

একটা কথা বাকি আছে।

বাঁশরী

কী বলো।

সোমশংকর

আমার ভালোবাসার কিছু চিহ্ন রেখে যাচ্ছি তোমার কাছে, ফিরিয়ে দিতে পারবে না। (অলংকারের সেই থলি বের করলে)

বাঁশরী

ও কী, ও-সব যে তলিয়ে ছিল জলে।

সোমশংকর

ডুব দিয়ে আবার তুলে এনেছি।

বাঁশরী

মনে করেছিলুম আমার সব হারিয়েছে। ফিরে পেয়ে অনেকখানি বেশি করে পেলুম। নিজের হাতে পরিয়ে দাও আমাকে। (সোমশংকর গয়না পরিয়ে দিলে)

শক্ত আমার প্রাণ। তোমার কাছেও কোনোদিন কেঁদেছি বলে মনে পড়ে না। আজ যদি কাঁদি কিছু মনে কোরো না। (হাতে মাথা রেখে কান্না)

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য

রাজাবাহাদুরের চিঠি।

বাঁশরী

(দাঁড়িয়ে উঠে) শংকর, ও চিঠি আমাকে দাও।

সোমশংকর

না পড়েই?

বাঁশরী

হাঁ, না পড়েই।

সোমশংকর

তবে নাও। (বাঁশরী চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল)

এখনো একটা কাজ বাকি আছে। এই সিগারেট কেস্ চেয়ে পাঠিয়েছিলে। কেন, বুঝতে পারি নি।

বাঁশরী

আর-একবার তোমার ঐ পকেটে রাখব বলে, এ আমার দ্বিতীয়বারকার দান।

সোমশংকর

সন্ন্যাসীবাবা আমাদের বাড়িতে আসবেন এখনই— বিদায় দাও, যাই তাঁর কাছে।

বাঁশরী

যাও, জয় হোক সন্ন্যাসীর।

সোমশংকরের প্রস্থান। লীলার প্রবেশ

লীলা

কী, ভাই—

বাঁশরী

একটু বোসো। আর একখানা চিঠি লেখা বাকি আছে, সেটা তাকে দিতে হবে তোরই হাত দিয়ে। (চিঠি লিখে লীলাকে দিলে) পড়ে দেখ্।

চিঠি

শ্রীমান ক্ষিতীশচন্দ্র ভৌমিক কল্যাণবরেষু—
তোমার ভাগ্য ভালো, ফাঁড়া কেটে গেল— আমারও

বিবাহের আসন্ন আশঙ্কাটা সম্পূর্ণ লোপ করে দিলুম। 'ভালোবাসার নীলামে' সর্বোচ্চ দরই পেয়েছি, তোমার ডাক সে পর্যন্ত পৌঁছত না। অন্যত্র অন্য কোনো সান্ত্বনার সুযোগ উপস্থিতমতো যদি না জোটে তবে বই লেখো। আশা করি, এবার সত্যের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে। তোমার এই লেখায় বাঁশরীর প্রতি দয়া করবার দরকার হবে না। আত্মহত্যায় এক পৈঁঠে পা বাড়িয়েই সে ফিরে এসেছে।

লীলা

(বাঁশরীকে জড়িয়ে ধরে) আঃ, বাঁচালি ভাই, আমাদের সবাইকে। সুষমার উপর এখন আর তোর রাগ নেই ?

বাঁশরী

কেন থাকবে ? সে কি আমার চেয়ে জিতেছে ? লীলা, দে ভাই, সব দরজা খুলে, সব আলোগুলো জ্বালিয়ে— বাগান থেকে যতগুলো ফুল পাস নিয়ে আয় সংগ্রহ করে।

লীলার প্রস্থান। পুরন্দরের প্রবেশ

বাঁশরী

এ কী সন্ন্যাসী, তুমি যে আমার ঘরে ?

পুরন্দর

চলে যাচ্ছি দূরে, হয়তো আর দেখা হবে না।

বাঁশরী

যাবার বেলায় আমার কথা মনে পড়ল ?

পুরন্দর

তোমার কথা কখনোই ভুলি নি। ভোলবার মতো মেয়ে নও তুমি। নিত্যই এ কথা মনে রেখেছি, তোমাকে চাই আমাদের কাজে— দুর্লভ দুঃসাধ্য তুমি, তাই দুঃখ দিয়েছি।

বাঁশরী

পার নি দুঃখ দিতে। মরা কঠিন নয় পেয়েছি তার প্রথম শিক্ষা। কিন্তু তোমাকে একটা শেষ কথা বলব সন্ন্যাসী, শোনো। সুষমাকে তুমি ভালোবাস, সুষমা জানে সেই কথা। তোমার ভালোবাসার সূত্রে গেঁথে ব্রতের হার পরেছে সে গলায়, তার আর ভাবনা কিসের। সত্য কিনা বলো।

পুরন্দর

সত্য কি মিথ্যা সে কথা বলে কোনো ফল নেই, দুইই সমান।

বাঁশরী

সুষমার ভাগ্য ভালো, কিন্তু সোমশংকরকে কী তুমি দিলে ?

পুরন্দর

সে পুরুষ, সে ক্ষত্রিয়, সে তপস্বী।

বাঁশরী

হোক পুরুষ, হোক ক্ষত্রিয়, তার তপস্যা অপূর্ণ থাকবে আমি না থাকলে, আবশ্যক আছে আমাকে।

পুরন্দর

বঞ্চিত হবার দুঃখই তাকে দেবে শক্তি।

বাঁশরী

কখনোই না, তাতেই পঙ্গু করবে তার ব্রত। যে পারে ঐ ক্ষত্রিয়কে শক্তি দিতে এমন কেবল একটি মেয়ে আছে এ সংসারে।

পুরন্দর

জানি।

বাঁশরী

সে সুষমা নয়।

পুরন্দর

তাও জানি। কিন্তু ঐ বীরের শক্তি হরণ করতে পারে এমনও একটিমাত্র মেয়ে আছে এ সংসারে।

বাঁশরী

আজ অভয় দিচ্ছে সে। আপন অন্তরের মধ্যে সে আপনি পেয়েছে দীক্ষা। তার বন্ধন ঘুচেছে, সে আর বাঁধবে না।

পুরন্দর

তবে আজ যাবার দিনে নিঃসংকোচে তারই হাতে রেখে গেলেম সোমশংকরের দুর্গম পথের পাথেয়।

বাঁশরী

এতদিন আমার যত প্রণাম বাকি ছিল সব একত্র করে আজ এই দিলেম তোমার পায়ে।

পুরন্দর

আর আমি দিয়ে গেলেম তোমাকে একটি গান, তোমার কণ্ঠে সেটিকে গ্রহণ করো।

গান

পিণাকেতে লাগে টংকার—
বসুন্ধরার পঞ্জরতলে কম্পন জাগে শঙ্কার।
আকাশেতে ঘোরে ঘূর্ণী
সৃষ্টির বাঁধ চূর্ণি,
বজ্রভীষণ গর্জনরব প্রলয়ের জয়ডঙ্কার॥
স্বর্গ উঠিছে ক্রন্দি,
সুরপরিষদ বন্দী,
তিমিরগহন দুঃসহ রাতে উঠে শৃঙ্খলঝংকার।
দানবদম্ভ তর্জি
রুদ্র উঠিল গর্জি,
লণ্ডভণ্ড লুটিল ধুলায় অভ্রভেদী অহংকার।